ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

রোমান্টিক প্রণয়কাব্য *গুলে বকাওলী*র অনন্যতা

*ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম

সারসংক্ষেপ: শিরোনামটির আলোচনায় যেহেতু রোমান্টিক কথাটি যুক্ত হয়েছে তাই রোমান্টিক প্রণয়কাব্য কী সে বিষয়ে স্বল্পপ্রয়াস ধারণা নেওয়া সংগত। তা-না হলে বোধগম্যতার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে যেতে পারে। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুগের পঞ্চদশ থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত মুসলিম কবিগণ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দিয়েছেন। উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের ফলশ্রুতিতে সাহিত্যের ভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে অনন্য সাধারণ ও অমর সৃষ্টি বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। এ বিষয়ে 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, 'মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরনের ভাষামিশ্র কবিতা নতুন প্রাণ পায় বিদেশি, ফারসি, আরবি, তুর্কি ও দেশি লৌকিক ভাষার সংযোগে। বাংলায় এই রীতি নতুন করে চলিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ়ের মুসলমান কবিদের এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায়।'[১] তাই সংগত কারণে আমরা বলতে পারি এগুলো মুসলিম কবি কর্তৃক প্রণীত অমর কীর্তি। মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাহিনি সৃষ্টির প্রেরণা আসে দুদিক থেকে। 'এক দিকে উত্তরভারতীয় রোমান্টিক কাহিনি, অন্যদিকে আরবীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত গালগল্প আমদানি করে।'[২] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মীয় আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সেই আচ্ছাদন ভেদ করে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে এসে মুসলিম কবিগণ রসমিশ্রিত একধরনের নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন। সরাসরি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব ও বিষয়ের সাথে রসের যোগান অন্বিষ্ট হয়ে রসমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। যা এই ধারায় দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে।

সাধারণত আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপাদান এবং উপকরণ নিয়ে অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যগুলো মানবিক বৈশিষ্ট্যে বিম্বিত হয়েছে। 'এসব কাহিনি কাব্যের বিষয় রূপকথাসুলভ রোমান্টিক গল্প মাত্র, সুতরাং এগুলোর বস্তু সুনির্দিষ্ট আবেদন ছিল দেশকালের পরিধির বাইরে।'[৩] সাহিত্যের এই যুগটি তাই ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত। বিশেষত কাহিনিকাব্য রচনার ক্ষেত্রে যুগটি আজও আবহমান বাংলায় চিরস্মণীয়। প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কল্পনা মিশ্রিত রোমান্টিক জগতে অবগাহন করে অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয়। তবে এই তুলনাহীন অতীতকে রোমান্টিক কবিগণ রূপ দিয়েছেন বাংলার চিরচেনা মাটি ও মানুষের নিকটস্থ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে সম্পর্কিত করে যাপিত জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনার আবেদনে। কল্পনাবিহারী মানুষের মন শিল্পসাহিত্যে যেহেতু কাহিনির সন্ধান করে এবং সে কাহিনি অবশ্যই রোমান্টিক ও চিত্তাকর্ষক হবে এমন কামনা করে, সেজন্য ধর্মকথার মধ্যেও তৎকালীন কবিগণ নির্বিচারে তাঁদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন অনেক বানানো ও উদ্ভট কল্পকাহিনি।[৪] যার মধ্যে কিছুটা সত্য ও কিছুটা কল্পনার সংমিশ্রণ যুক্ত হয়ে লৌকিক বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পেরেছে। এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেন বলেন:

> এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাত্ম্য কাহিনি নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। বিশুদ্ধ প্রণয় কাহিনির দিকে তাঁদের তেমন কোনো নজর ছিল না।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

> হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক সাহিত্য ধর্ম সাহিত্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যেরে সঙ্গে ধর্মের কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়েনি। সুতরাং দেবমাহাত্ম্য নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনি রচনায় তাঁরা (মুসলমানগণ) নিরঙ্কুশ ছিলেন। এই জন্যই হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাহিনি রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী ও একাধিপতি।[৫]

মধ্যযুগের প্রধান দুটি ধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান অন্যতম। রোমান্টিক কাব্যে বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে মর্ত্যের অধিবাসী ও রক্তমাংসে গড়া মানবমানবীর প্রণয়কাহিনি। এসব কাহিনিকাব্যে পুরনো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্র দখল ছিল।[৬] যেখানে গভীর জীবনচেতনা গড়ে উঠেছে দেববাদ বিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রভাবে। এসব কাহিনিতে বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়ে আনন্দের পরিচর্যা আধিক্যতা লাভ করে বলে সাধারণের মনে তার একটি স্থায়ী আসন গড়ে ওঠে।[৭] রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলো সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মূলত শিল্পসৃষ্টি ও রসবোধের সঞ্চার করা। চতুর্দশ শতকের শেষ অথবা পঞ্চদশ শতকের সূচনালগ্নে মধ্যযুগের প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কর্তৃক 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এই ধারাটির সৃষ্টি হয়।[৮] পরবর্তীতে অসংখ্য কবির হাতে এই ধারার বিকাশ ঘটে জনপ্রিয় একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। যা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল সম্প্রসারিত।

রোমান্টিক কাব্যসাহিত্য সম্পর্কিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, মধ্যযুগের অপর একটি শাখার নাম 'দোভাষী সাহিত্য।'[৯] এই দোভাষী সাহিত্যেও রোমান্টিক আবেদন প্রচ্ছন্নভাবে নানা বৈশিষ্ট্যে স্থান করে নিয়েছে। তবে 'দোভাষী সাহিত্যে' রোমান্টিক আবেদন স্থান পেলেও রোমান্টিক মাধুর্য তীর্যক ও তীক্ষ্ণ যাতনায় উজ্জ্বলতা লাভে সক্ষম হয়ে ওঠতে পারেনি।[১০] তাই রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ দোভাষী সাহিত্যে অনুপস্থিত। রোমান্টিক কাহিনিকাব্যের ধারায় কাব্যরচনা করে যেসব কবিসাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন তাঁদের একটি সারণিও তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক।

সারণি

কালপর্ব	কবির নাম	কাব্যের নাম
পনের শতক	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা
ষোল শতক	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী মজনু
	মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী
	সাবিরিদ খান	হানিফা কয়রাপরি, বিদ্যাসুন্দর
	দোনাগাজী চৌধুরী	সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল
সতের শতক	দৌলত কাজী	সতীময়না-লোরচন্দ্রানী
	আলাওল	পদ্মাবতী, সপ্তপয়কর
	কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী
	আবদুল হাকিম	লালমতী সয়ফুলমুলুক
	নওয়াজিস খান	গুলে বকাওলী
	মঙ্গল চাঁদ	শাহজালাল-মধুমালা
	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবলমুলুক শামারোখ
আঠারো শতক	মুহম্মদ মুকীম	মৃগাবতী
	শেখ সাদী	গদামল্লিকা

সারণির বাইরে আরও অনেক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত একাধিক কবির একই বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা করার নিদর্শন রয়েছে। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই ধারার কাব্যরচনার বিবরণ জনৈক কবির রচনাতেও পাওয়া যায়। তাই বলতে হয় বাংলা সাহিত্যে আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে এসব প্রণয়কাহিনি রচিত হয়েছে। রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচিত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য ছিল না। সাহিত্য যে ধর্মপ্রধান না হয়ে রস প্রধান হতে পারে একথা তখন বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনাও করতে পারেননি।[১১] তাই সে সময় সর্বাগ্রে মুসলমান কবিগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রসপ্রধান ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টির দিকে। শ্রোতার মনে এবং পাঠক হৃদয়ে রসঘন ও আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রেরণা ছিল কবিগণের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, 'এ শ্রেণির সাহিত্যের বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক রস বা মানবতার রস আস্বাদন করা।'[১২] প্রণয়কাহিনিতে মানবীয় আবেদন সম্বলিত প্রেমচিত্র প্রস্ফুটিত হলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদে পাওয়া যায় সুফি সাধনার নিদর্শন। কাব্যগুলোতে প্রেমময় সুফিসাধনার পরিণতি হিসেবে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনকামনা অন্বিষ্ট হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত এমন আবেদন মানবীয় কামনা বাসনার প্রাবাল্যে সংহত রূপ লাভ করতে পারেনি। কেননা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা এসব কাব্যের লক্ষ্য ছিল না। সে কারণে প্রণয়কাব্যের উপাদানগত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এগুলো বাঙালির ঘরের নয়; বরং এগুলো বাইরে থেকে সংগৃহীত করে বাংলা কাব্যে প্রযুক্ত করার মধ্য দিয়ে একটি রূপচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম জেলায় যেসব কবির আগমন ঘটে তাঁদের মধ্যে কবি নওয়াজিস খান অন্যতম। এই কবির প্রকৃত নাম খোন্দকার মুহম্মদ নওয়াজিস খান।[১৩] তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার 'সুখছড়ি' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটিতে বর্তমানেও কবির বংশধরগণ বসবাস করছেন।[১৪] কবির জীবনকথা বিষয়ে কবি বংশের পণ্ডিত আতাউল্লা খাঁর মাধ্যমে জানা যায় কবি নওয়াজিস খান মঘী ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তখন কবি যুবক।[১৫] ড. মুহম্মদ এনামুল হক এমন কথার সমর্থন দিয়েছেন। আবার অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি পরিচিতি'তে বলা হয়েছে কবির বংশধর আতাউল্লা পণ্ডিত সাহেবের মতে নওয়াজিস খান ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১২৭ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[১৬] কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এমন ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম তাঁর একটি প্রবন্ধে।[১৭] জানা যায় দীর্ঘজীবী এই মানুষটি ছিলেন মহাকবি আলাওলের সমসাময়িক। তবে আলাওলের তিরোধানের পরেও তিনি বেঁচে ছিলেন এমন তথ্যসূত্রের উল্লেখ আছে।[১৮] কবি বংশের আদি পুরুষ ছিলেন ছিলিম মোড়ল। তিনি 'ছিলিমপুর' গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। এই ছিলিম খাঁ যে গৌড় থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন তারও বিবরণ পাওয়া যায় ভণিতায়। ভণিতার ভাষায়:

প্রপিতামোহোর পিতা গৌড় হন্তে আসি।
গোত্র সনে চাটিগ্রামে করিল নিবাসী ॥[১৯]

কবি নওয়াজিস খান রচিত *গুলে বকাওলী* কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে একটি বংশ পীঠিকা দেওয়া হয়েছে।[২০] সে পীঠিকার মাধ্যমে কবিবংশের প্রকৃত পরিচয় জানা যায়। বংশ তালিকাটি সংগত কারণে তুলে ধরতে হয়।

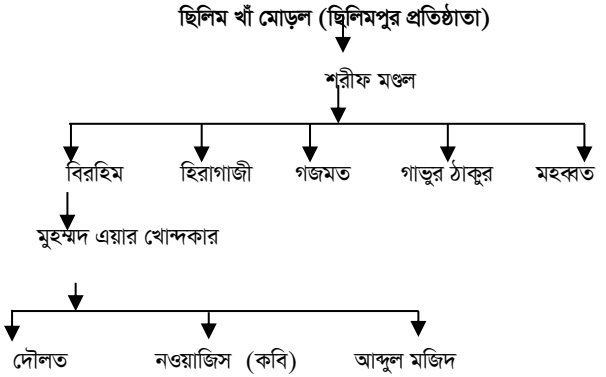

বংশ পীঠিকা ছাড়াও *গুলে বকাওলী* কাব্যের ভণিতার মধ্য দিয়েও কবি এবং তাঁর বংশের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন এই বংশটি বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায় পিরবংশ হিসেবে সর্বজন পরিচিত ছিল মর্মেও অবগত হওয়া যায়। ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী কবি নওয়াজিস খানের জ্ঞানের পরিধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশিষ্টতা ছিল বিশাল মাত্রায় পরিপূর্ণ। যা তাঁরই আত্মবৃত্তান্ত থেকে পাওয়া যায়। কাব্যের ভাষায়:

ছিলিম মড়ল নামে সবে পাএ চিন ॥
তান সুত শরীফ মোড়ল গুণধর।
সেহ ভাগ্যবন্ত ছিল মহীর উপর ॥
* * * * * * * * * *
শরীফ মল্লের গৃহে হৈল পঞ্চসুত।
একে একে বলবন্ত অতি অদ্ভুত ॥
বিরহিম নামে হিরা গাজি গজমত।
গাভুর ঠাকুর আর নামে মহবত ॥
* * * * * * * * * *
বিরহিম ঔরসে বিনানু গর্ভে ছিতি।
মোহাম্মদ এয়ার নামে হইল সন্ততি ॥
* * * * * * * * * * *
তাহান প্রথম সুত নামে দওলত।
শাস্ত্র শিক্ষা পিতা হন্তে লৈল খেলাফত ॥
তাহান কনিষ্ঠ মুঞি নোয়াজীস নাম।
অল্প শাস্ত্র, অল্প বুদ্ধি অল্প জহ কাম ॥
* * * * * * * * * *
মোহোর কনিষ্ঠ ভাই ছিল বলবন্ত।
আবদুল মজিদ নামে হাফিজ মোহন্ত ॥[২১]

কবির পিতা মুহম্মদ এয়ার খন্দকার বনজঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে 'আমীর আবাদ' (আমীরাবাদ) নামক একটি স্থানে বসতি গড়ে তোলেন। বর্তমানে গ্রামটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার 'সুখছড়ি' গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কবির মাতামহী ছিলেন গাজীমল্লের কন্যা বিনানু বিবি। গাজীমল্ল ছিলেন যেমন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান, তেমনই বিত্তবান। কবির বড়োভাই দৌলত এবং ছোটোভাই আব্দুল মজিদসহ ভ্রাতাত্রয়ী ছিলেন সুশিক্ষিত। বড়োভাই বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে খেলাফত প্রাপ্ত হন। ছোটোভাই মজিদ ছিলেন পবিত্র কোরানের হাফেজ। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও সুললিত কণ্ঠে তিনি পবিত্র কোরান শরিফ তেলাওয়াত করতেন। আর নওয়াজিস খান ছিলেন যেমন প্রাজ্ঞ, তেমনই বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শী। এ বিষয়ে 'তুতিনামা' গ্রন্থের রচয়িতা মোহাম্মদ নকি তাঁর গ্রন্থটিতে কবি নওয়াজিসকে একটি চরণের মধ্য দিয়ে 'গুরুকবি' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে নওয়াজিস খান ঈশ্বরপ্রদত্ত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। যা গ্রন্থ 'বকাওলী'তে তার ছাপ বিদ্যমান।[২২] তিনি ছিলেন তাঁর পিতার স্নেহধন্য সন্তান। কবি তাঁর গুরু হিসেবে মৌলভি আতাউল্লার ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। আতাউল্লা পির হিসেবেও অঞ্চলটিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একজন পির গুরুর দীক্ষার কারণে সুফিশাস্ত্রেও তিনি দীক্ষিত ছিলেন। এমন কি ভারতীয় দেহতত্ত্ব সম্পর্কেও কবি নওয়াজিস খান ছিলেন দক্ষ। তিনি ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবেও সমাজে পরিচিত ছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, 'নওয়াজিস খানের পেশা ছিল খোন্দকারী। অর্থাৎ মসজিদসংলগ্ন মক্তবে শিক্ষকতা ও পালাপার্বণে মোল্লার কাজ করতেন।'[২৩] মসজিদ নির্মাণের জন্য মঙ্গদ নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তি গোলাম শিকদারের নিকটে তিনি ভূমি প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন। একজন শিক্ষিত ও মানবহিতৈষী মননের ব্যক্তি হিসেবে তাঁর লেখনি শাণিত।

গ্রন্থরচনার পটভূমি

কবি নওয়াজিস খান রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *গুলে বকাওলী* গ্রন্থটি যেমন অনন্য তেমনই শ্রেষ্ঠ।[২৪] গ্রন্থটি তিনি চট্টগ্রামের বাণীগ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে পারস্য উপাখ্যান অবলম্বনে প্রণয়ন করেন। ভণিতার বর্ণনায় এমন কথার প্রমাণ মেলে। ভণিতার ভাষায়:

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মহানৃপকূল জাত
দাতা অতি দানি শুদ্ধরীত।
তাহান আরতি শুনি হীন নোয়াজীসে গুণি
বকাঅলি পুস্তক রচিত।।[২৫]

কবি নওয়াজিস খানের *গুলে বকাওলী* গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ আখ্যানকাব্য। গ্রন্থের পটভূমিতে সংযুক্ত আছে হামদ ও না'ত অংশ। এই হামদ ও না'ত অংশে সুফিবাদ ও আধ্যাত্মতত্ত্বের নিদর্শন বিম্বিত হয়েছে। সেইসাথে পটভূমিতে যুক্ত হয়েছে নানা তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রবাণী। তবে পটভূমির কাহিনি একান্তই ভারতীয়। ভারতে বিভিন্ন সময়ে দুটি ফারসি *গুলে বকাওলী*র সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি অযোধ্যার নবাব পরিবারের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত 'আওধ ক্যাটালগে' বর্ণিত *গুলে বকাওলী*র পাণ্ডুলিপি। যেটির কথা উল্লেখ করেছেন স্প্রিংগার সাহেব। রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১০৩৫ হিজরি অর্থাৎ ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ।[২৬] এটি দাকিনি বা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন উর্দু ভাষায় রচিত। তবে গ্রন্থটির কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। আর অন্যটির বিষয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুনশি নেহালচান্দ লাহোরি জানিয়েছেন তিনি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শেখ ইজ্জতুল্লাহর

ফারসি ভাষায় প্রণীত *তাজুলমুলুক গুলে বকাওলী* গ্রন্থ অবলম্বনে উর্দু ভাষায় গদ্যে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন।[২৭] ইজ্জতুল্লাহ ছিলেন বাঙালি। তাঁর কাব্যটি রচিত হয় ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে।[২৮] এই গ্রন্থটিরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। সাহিত্যিক বিশেষজ্ঞগণ কাব্যের কাহিনিধারা বাংলাদেশের নয় বলেও মনে করেন। তাঁরা এর পটভূমি ও কাহিনিকে মধ্যভারতের হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইজ্জতুল্লাহ সেখান থেকে এর নির্যাস আহরণ করেছেন।[২৯] কবি নওয়াজিস খান এসব ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন মর্মে ড. ওয়াকিল আহমদ মনে করেন। এমন কথা যদি সত্যে রূপ পায়, তাহলে ধরে নিতে হয় কবি নওয়াজিস খান ১৭২২ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর বাংলা 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। আর সে সময় কবি ছিলেন যেমন প্রাজ্ঞ ও তেমনই প্রৌঢ়। এমন কি প্রথম কাব্যটিও নওয়াজিস খানের নজরে আসা অস্বাভাবিক নয়। এছাড়াও উপরে বর্ণিত মধ্যযুগের 'দাকিনি' বা দাক্ষিণাত্যের সাথে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। সেদিক থেকেও ধরে নেওয়া যায় কবি নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি সতের শতকে রচিত। তাই পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনুমিত হয় কবি নওয়াজিস খান ইজ্জতুল্লাহর কাব্য অনুসরণে 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি রচনা করেছেন। আর যেহেতু ইজ্জতুল্লাহ জাতিতে ছিলেন বাঙালি, তাই একজন বাঙালি হয়ে বাঙালির ভাবভাষা সহজে উপভোগ্য হবে এমনটি স্বাভাবিক। এছাড়াও ইজ্জতুল্লাহর কাব্যটি যে খুব জনপ্রিয় ও সুখপাঠ্য ছিল তার প্রমাণ মেলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি লন্ডন (ভারতীয় অফিস), বার্লিন, অক্সফোর্ড, বাঁকিপুর ও কলকাতায় পাওয়া যায়।

তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায় *গুলে বকাওলী* কাব্যটির কাহিনি কবি নওয়াজিস খানের নিজস্ব সৃষ্টি বা মৌলিক রচনা নয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ জানান, তাজুলমুলুক ও গুলেবকাওলী নামক নায়ক-নায়িকার নাম আরবি-ফারসি হলেও কাহিনি ভারতীয়। হয়তো কোনো মৌলিক রূপকথাই এ কাব্যের উৎস।[৩০] তিনি কেবল অন্যভাষা থেকে এটির উপাদান ও উপকরণ নিয়ে নিজস্ব আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যে প্রণয়ন করেছেন। তবে কোন ভাষা থেকে তিনি গ্রন্থটির নির্যাস গ্রহণ করেছেন তার কোনো সূত্র বা তথ্যের তিনি উল্লেখ করেননি। তবে এ বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন:

মোহন্তের আজ্ঞা মন-পাটেত রাখিয়া
হীন নোয়াজীসে কহে কিতাব দেখিয়া ॥[৩১]

ফারসি ও উর্দু ভাষায় একাধিক *গুলে বকাওলী* রচনার তথ্য পাওয়া যায়। তবে হিন্দি ভাষায় এ গ্রন্থ রচনার তথ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ বিষয়ে গারেসাঁ দেশাতী 'গুলে বকাওলী'র কাহিনি সম্পর্কিত বর্ণনায় একটি উর্দু মসনবীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এটির নামকরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'তোহফা-এ মজলিসে সালাতীন'। এটির রচনাকাল নিয়ে একাধিক মতান্তর আছে। গারেসাঁ দেশাতীর মতে এটির রচনাকাল ১১৫১ হিজরি (১৭৩৮ খ্রি.)।[৩২] রামবাবু সকসিনার মতে এটির নাম *তোহফাতুল মজলিস* এবং রচনাকাল ১০৫৩ হিজরি (১৬৪৩ খ্রি.)।[৩৩] ড. জ্ঞানচন্দ্র জৈনের মতে গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'তোহফাতুল মজলিস এ সালাতীন' এবং এর রচনাকাল ৭৮৬ হিজরি (১৩৮৪ খ্রি.)।[৩৪] তবে তাঁর রচনাকাল তিনি কোন সূত্রের আলোকে পেয়েছেন তার উল্লেখ করেননি। পুথিসাহিত্যের গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানার মতে, কবি নওয়াজিস খান 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি ইজ্জতুল্লাহর কাব্য

(১৭২২ খ্রি.) অনুসরণে প্রণীত করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, রোমান্টিক কাব্য 'গুলে বকাওলী' সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত।[৩৫] এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।[৩৬] অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে, কবি নওয়াজি খান ১৭৩০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় তাঁর এ কাব্যটি রচনা করেছেন।[৩৭] তবে গ্রন্থটির পটভূমি যে রোমান্টিক ভাবনায় অম্বিষ্ট সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

কাব্যের কাহিনি

কবি নওয়াজিস খানের রচিত *গুলে বকাওলী* কাব্যের কাহিনির নির্যাসে পাওয়া যায় নায়ক তাজুলমুলুক ও নায়িকা বকাওলী পরির প্রণয়কথা। আর শাখা-কাহিনি হিসেবে যুক্ত হয়েছে তাজুলমুলুকের অমাত্য বাহরাম ও বকাওলীর বান্ধবী বা সখি রুহ আফজার প্রণয়কাহিনি। 'গুলে বকাওলী' কাব্যের কাহিনির সারোৎসারে পাওয়া যায় শর্কস্তানের বাদশা ছিলেন জয়নুল মুলুক। তাঁর পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করলে নাম রাখা হয় তাজুলমুলুক। এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, বাদশা বার বছরের মধ্যে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারবেন না। এর পরেও যদি সন্তানের মুখ দর্শন করতে চান তাহলে তিনি চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবেন। জ্যোতিষীর কাব্য 'তাহাকে দর্শিয়া চক্ষু মূলে হৈব নাশ।'[৩৮] জ্যোতিষীর এমন বাণী শোনার পর থেকে প্রতিরোধ গ্রহণের নিমিত্তে বাদশা তাঁর অমাত্যকে নির্দেশ দেন শিশুপুত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার। বাদশার আদেশ পেয়ে অমাত্য দূরবর্তী একটি স্থানে সাধ্যমতো আবাস নির্মাণ করে শিশুপুত্রকে রেখে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাব্যের ভাষায়:

ভাবি তাহা কহে শাহা অমাত্য ডাকিয়া।
দূরান্তর টঙ্গীঘর দিবারে বান্ধিয়া ॥
তথা নেও শিশুবর মহিষী সঙ্গতি।
ধনে জনে পূর্ণিতে পাঠাও শীঘ্রগতি ॥[৩৯]

বাদশার আদেশে অমাত্য দূরস্থিত টঙ্গিঘর নির্মাণ করে তথায় শিশুপুত্রকে রাখার ব্যবস্থা করেন। সেখানে বাড়ন্ত হতে থাকলে তাজুলমুলুকের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। এক পর্যায়ে তাজুল মুলুক 'বহুশাস্ত্র পড়িয়া হইল গুণবন্ত।'[৪০] বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করে শিশুপুত্র তাজুল বড়ো হয়ে যায়। এদিকে রাজা জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী শোনার পর থেকে তা প্রতিপালনে চরম তৎপর। এর পর দেখা যায় 'বিধির বিধান অলঙ্ঘণীয়' হয়ে ওঠেছে। তারই সূত্রে বাদশা মৃগয়ায় এলে দৈবক্রমে পুত্র তাজুলের সাথে দেখা হয়ে যায়। 'বাপে পুত্রে দরশন সংযোগ হৈল তবে।'[৪১] পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই বাদশা জয়নুলের দৃষ্টিশক্তি নিরুদ্দিষ্ট হয়। 'দৃষ্টি না প্রকাশে দেখি হইলুম অন্ধ।'[৪২] বাদশা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হলে প্রতিকারের জন্য এসে উপস্থিত হয় অসংখ্য গুণীবৈদ্য। এই গুণীবৈদ্য জ্যোতিষী পূর্বেই বাদশাকে জানিয়েছিল বার বছরের আগে তাঁর কনিষ্ঠ ও পঞ্চম পুত্রকে দর্শন করলে বাদশার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে। তাই বাদশার দৃষ্টিশক্তি হারানোর বিষয়টি ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিফলন। এমন প্রেক্ষিতে প্রতিকারের জন্য করণীয় হিসেবে নানাজনের নানাকথার মধ্য দিয়ে বকাওলী ফুলের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। বৈদ্যরা জানান বকাওলী ফলে এনে বাদশার চোখে স্পর্শ করলে দৃষ্টিশক্তি পূর্বের মতো ফিরে আসবে। আর এই ফুল পাওয়া যাবে কেবল বকাওলী পরির উদ্যানে। সেখানে থেকে এই ফুল সংগ্রহ করা

বড়ই কঠিন কাজ। রাজ্যে ঢোল বাজিয়ে ফুল সংগ্রহের কথা জনসাধারণের মাঝে জানিয়ে দেওয়া হয়। কাব্যের ভাষায়:

বকাওলী পুষ্প যেবা আনি দিতে পার।
বহু ধনরত্ন ভূমি দিব আমি তারে ॥[৪৩]

ফুল সংগ্রহ করার কাজটি ছিল বড়োই কঠিন। তাই এই কঠিন কাজটি প্রতিপালনের জন্য যখন কেউ এগিয়ে আসেনি, তখন বাদশার চারপুত্র ফুল সংগ্রহের জন্য পিতার অনুমতিক্রমে অসংখ্য লোকবল ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাত্রা করে। এমন সময়ে বাদশার দেশান্তরিত কনিষ্ঠপুত্র তাজুলমুলুক ভাইদের যাত্রাপথের দলবল ও সৈন্যদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে ফুল সংগ্রহকারীদের দলে যুক্ত হয়।[৪৪] যাত্রাপথে তারা অসংখ্য নদনদী, পথপরিক্রমা ও চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তারা প্রাচীর বেষ্টিত ফেরদৌস নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নগরীতে বাস করতো আইয়ারা নামের একজন রূপসী ও ধনাঢ্য বেশ্যা। এই রূপসী বারবণিতা আইয়ারার সাথে কপট পাশাখেলায় বাদশার চারপুত্র পরাজিত হলে তাদেরকে বন্দিজীবনে প্রবেশ করতে হয়। অপরদিকে তাজুলমুলুক আইয়ারার সাথে পাশাখেলায় জিতে গিয়ে তাকে পরাজিত করে। এমন প্রেক্ষিতে বেশ্যা আইয়ারা তাজুলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সেইসাথে তাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানায়। এমন অনুরোধের পর তাজুলমুলুক আইয়ারাকে বিয়ে করে। বিয়ের পরেও তাজুলমুলুক বকাওলী ফুল আনয়নের জন্য তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে নিজ কর্তব্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কাব্যের ভাষায়:

যাইতে প্রতিজ্ঞা মোর সে পুষ্প যথায়।
মোহোরে পাষণ্ড বাক্য না কহ সদায় ॥
সহজ মনিষ্য আমি ক্ষীণ কলেবর।
তথাপিও দেও পরি নহে সমস্বর ॥[৪৫]

ফুল সংগ্রহের জন্য পুনরায় তাজুলমুলুকের যাত্রা শুর হয়। যাত্রাপথে এক দৈত্যের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই দৈত্য তাকে বকাওলী ফুল পাওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। তার পরামর্শে সে বকাওলী উদ্যানের প্রধান প্রহরী হেমালা দেও-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। হেমালা দেও তাকে তার পালিত কন্যা মাহমুদাকে বিবাহের অনুরোধ করলে সে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর বকাওলী ফুলের জন্য হেমালা দেও একটি সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান দিয়ে সে সুড়ঙ্গ পথে ফুল সংগ্রহের পরামর্শ দেন। এরপর সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে তাজুলমুলুক তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যায়।

ফুল সংগ্রহর জন্য সুড়ঙ্গ পথে তাকে খুব সাবধানে আসতে হয়। এরপর সে একটি কুপের মধ্যে তার সেই কাঙ্খিত বকাওলী ফুলকে দেখতে পায়। তাজুল 'কুপেতে নামিয়া সেই পুষ্প তুলি লৈল।'[৪৬] খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কূপ থেকে ফুল সংগ্রহ করে। সংগৃহীত ফুল পেয়ে এসে পড়ে তার ফেরার পালা। সেখান থেকে সে কয়েক কদম এগিয়ে আসতেই নজরে আসে সুরম্য ও জ্যোতির্ময় এক অপূর্ব টঙ্গি। সে টঙ্গিতে নিদ্রাভিভূতা ও মন মাতানো এক সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে পায়। রাজকন্যাকে দেখে তার মনে হয়েছে 'ত্রিলক্ষ্য মোহিনী কৈন্যা নাহিক তুলন।'[৪৭] রাজকন্যাকে দেখে তার প্রেমিক হৃদয়ে এক অদম্য রূপতৃষ্ণা সঞ্চারিত হয়ে ওঠে। কাব্যের ভাষায়:

তেন রূপে চলি গেল টঙ্গির উপর।

এক কন্যা শুতিয়াছে দেখিল গোচরে ॥
মহা রূপবতী সেই প্রশংসা অতুল।
স্বর্গের উদ্যানে যেন বিকশিত ফুল ॥[৪৮]

ঘুমন্ত অবস্থায় রাজকন্যা বকাওলী পরির রূপ দেখে তাজুলমুলুক মুগ্ধ হয়ে পড়ে। এই পরিকে পাওয়ার জন্য নিদর্শন হিসেবে রাজকন্যার সাথে একটি অঙ্গুরি বিনিময় করে। মুগ্ধ হয়ে সে 'আপনার কিছু নিদর্শন রাখি যাই।'[৪৯] নিদর্শন হিসেবে অঙ্গুরি বিনিময় করার পরেও তাজুলমুলুক আত্মতুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। ফলে তার মনে সন্দেহ ও সংশয় প্রতিনিয়ত কাজ করতে থাকে। অবশেষে সেই সন্দেহ ও সংশয় দূর করার জন্য বকাওলী পরির শাড়ির আঁচলেও একটি প্রেমপত্রও বেঁধে রাখে। শাড়ির আঁচলে প্রেমপত্র বেঁধে রেখেও তাজুল স্থির থাকতে পারেনি। এমন মুহূর্তে তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই নিজেই নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করে জানায়:

প্রাণ মোর সতত রহিল তোমা ঠাঁই।
শূন্য ঘটে বিচ্ছেদের পন্থে আমি যাই ॥
প্রেম খড়্গে চিত্ত মোর কাটি অনুপাম।
শত খণ্ড হৈয়া রহিছে এক ঠাঁম ॥[৫০]

অবশেষে বকাওলী পরির উদ্যানের সংগৃহীত বকাওলী ফুল এবং তথায় তার বিয়ে করা স্ত্রী হেমালা দেও-এর পালিত কন্যা মাহমুদাকে নিয়ে আইয়ারার দেশে ফিরে আসে। কারণ আইয়ারার দেশে তার অগ্রজ চারভাই বন্দি অবস্থায় বিরাজমান। এখন বন্দি ভাইদের মুক্ত করার পালা। অবশেষে সে তার বন্দি ভাইদেরও মুক্ত করে দাসত্ব উন্মোচন করে। দাসত্ব থেকে রক্ষা পেয়ে তার চারভাই তাজুলমুলুকের নিকট থেকে বকাওলী ফুল কেড়ে নিয়ে স্বদেশে তারা পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। আজহার ইসলামের মতে, 'তাজুলের অনেক কষ্টে সংগৃহীত ফুলটি সঙ্গী চারভাই জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়।'[৫১] এরপর জ্যোতিষীর কথামতো বকাওলী ফুল জয়নুল বাদশার চোখে স্পর্শ করা মাত্রই বাদশা জয়নুলমুলুক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং স্বাভাবিক অবস্থার মতো দেখতেও পান। ফলে তার চারভাই পিতার কাছে প্রশংসিত হন। তবে ফুল সংগ্রহের প্রকৃত ঘটনাটি জয়নুল বাদশার কাছে একেবারে আড়ালে থেকে যায়।

কাব্যের নায়ক তাজুলমুলুকের সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা বকাওলী ফুল তার চারজন বড়োভাই প্রতারণা করে কেড়ে নেওয়ার পর থেকে সে শর্কস্তানের নিকটবর্তী এক অরণ্যে এসে বসতি গড়ে তোলে। সে অরণ্যে হেমালা দৈত্যের সহায়তায় বকাওলী উদ্যানের মতো একটি নতুন উদ্যানও তাজুল তৈরি করে। নতুন তৈরিকৃত উদ্যানে মাহমুদা ও আইয়ারাকে নিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে থাকে। এদিকে নতুন উদ্যানে বসবাসের কথা বাদশা জয়নুলের কানেও আসে। একদিন তাজুলমুলুক বাদশা জয়নুলকে তার উদ্যানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাদশা জয়নুল উদ্যানে গিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়। কাব্যের ভাষায়:

দুই নৃপ যদি সে হইল মুখামুখি।
চন্দ্রসূর্য যেহেন হইল দেখাদেখি ॥
স্বর্ণে স্বর্ণে মুখামুখী দৃষ্টাদৃষ্টি ময়।
সিন্ধু সিন্ধু মিশি যেন তরঙ্গ খেলয় ॥[৫২]

জয়নুল বাদশা তাজুলমুলুকের উদ্যানে আসার পর এক পর্যায়ে বুঝতে পারে তাজুলমুলক তারই কনিষ্ঠপুত্র এবং আরও জানতে পারে এর জন্যই তিনি তার হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। পুত্রের এহেন কৃতিত্বের পরিচয় জেনে বাদশা চরম খুশি হন। বাদশার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে অপর চারপুত্রের কোনো অবদান নেই। কেবল ছোটোপুত্রের একক অবদানের কথা জানতে পেরে ছেলেকে শর্কস্তানে এসে বসবাস করার জন্য বাদশা জয়নুল আহ্বান জানায়। পিতার আহ্বান ও অনুরোধের পরেও তাজুলমুলুক শর্কস্তানে এসে বসবাস করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

বকাওলী পরি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পায় একটি অঙ্গুরি ও প্রেমপত্র। এই দুটি নিদর্শন পেয়ে ব্যক্তি তাজুলমুলুক সম্পর্কে জানতে পারে পরিকন্যা বকাওলী। তাই তাজুলমুলুককে দেখার জন্য উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। তাজুলমুলুকের সন্ধানে বকাওলী পরি ছদ্মবেশে ঘুরতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সওদাগরের রূপ ধারণ করে শর্কস্তানে এসে তাজুলমুলুকের সাথে দেখা করে। দেখা করার পর উভয়ে উভয়ের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারে। এর পর হেমালা দৈত্যের সহযোগিতায় বকাওলী ও তাজুলমুলুকের মিলন হয়। মিলন পরবর্তী বকাওলীর সাথে কুমারকে দেখতে পেয়ে বকাওলীর মাতা জমিলা খাতুন চরম ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধ হয়ে যা বলেন তা এমন:

ক্রোধ করি কৈন্যারে উদ্যানে আইল রাণী।
শ্রবণে শুনিয়া বহু অপযশ বাণী ॥
বহুল প্রকার বাক্য লাগিল গর্জিতে।
সাঁচানি হইছে প্রেম মানব সহিতে ॥[৫৩]

বকাওলীর মা বকাওলীর সাথে তাজুলকে দেখে বকাঝকা করার পর থেমে থাকেননি। এর পর চরম রেগে গিয়ে তাজুলকে প্রহার করতে শুরু করে। এমনকি প্রহার করার পরেও তার মা জমিলা নিজের ক্রোধকে সংবরণ করতে পারেন নি। এক পর্যায়ে রাগের মাত্রা চরমমুহূর্ত ধারণ করে কুমার তাজুলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। কাব্যের ভাষায়:

যখনে জমিলা খাতুন কুমার ধরিয়া।
পবন উপরে যবে মারিল মেলিয়ম ॥[৫৪]

কুমার তাজুল সমুদ্রে নিক্ষেপিত হলে সৌভাগ্য ও দৈবক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। 'ডুবি ভাসি বহু দুক্ষে জীবন রহিল।'[৫৫] নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কুমার সমুদ্র তীরবর্তী শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে এসে ঠাঁই পায়। দিন শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তখন একটি বৃক্ষে আশ্রয় নেয়। রাত যখন ঘনিয়ে আসে তখন সমুদ্র থেকে একটি বিশাল অবয়বের সাপ এসে বৃক্ষের নীচে মণি রেখে শিকারে বেরিয়ে পড়ে। কুমার কৌশল বুঝে সে মণি গ্রহণ করে তা নিজ উরুর মধ্যে লুকিয়ে রেখে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে। বনের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পথের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক একটি সরোবর দেখতে পায়। এমনকি সুযোগ বুঝে সে সরোবরে গোসলও করতে নামে। সরোবর থেকে গোসল করে ওঠার পর কুমার দেখতে পায় তার দেহ বা শরীর রমণীতে পরিণত হয়েছে-'আপনার অঙ্গ দেখে নারীর আকার।'[৫৬] এমন অবয়ব ধারণ করার পর সে প্রলাপরত হয়ে আকুতি প্রকাশ করে বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিলাপ করতে থাকে। হেনকালে একজন

এসে তাকে বলে 'পুরুষ আছিলু নারী হইলু এখন।'[৫৭] এমন প্রেক্ষিতে উপস্থিত লোকটি তাজুলকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। সেখানে রমণী রূপ ধারণকৃত তাজুলের একটি সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় তাজুলমুলুক সেই অরণ্যের অপর একটি পুকুরে দ্বিতীয়বার গোসল করলে দৈত্যের আকার ধারণ করে এবং তৃতীয়বার গোসল করার পর পূর্বের চরিত্র ফিরে পায়।[৫৮] পুরুষচরিত্র ফিরে পাওয়ার পর অরণ্য অতিক্রম করে সে একটি পর্বতে গিয়ে পৌঁছে। সে পর্বতে কুমার একটি সুরম্য টঙ্গি দেখতে পায়। আরও দেখতে পায় টঙ্গিতে একটি রূপসি কন্যা অবস্থান করছে-'কন্যা এক টঙ্গি মধ্যে দেখিলেক গিয়া।'[৫৯] সে কন্যার সাথে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে তাজুলমুলুকের পরিচয়ও ঘটে। পরিচয়ে সে জানতে পারে এই রূপসি কন্যার নাম রুহ আফজা। 'গুলে বকাওলী' কাব্যে বর্ণিত আলাপচারিতার প্রসঙ্গটি এমন:

তবে কন্যা কুমারেত কহিতে লাগিল।
আদি অন্ত যত ইতি পরিচয় দিল ॥
বলিলেক রূহ আফজা শুন মোর নাম।
পরি নৃপতির সুতা ফেরদৌসেতে ঠাম ॥
পিতা মোর মুজাফফর শাহা পাট পতি।
পরি সবে তাহার বচন মানে নিতি ॥[৬০]

কুমার আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে জানতে পারে দুরাচারী শ্যামদেও নামক একজন ব্যক্তি রুহ আফজাকে অপহরণ করে পর্বত টঙ্গিতে এনে বন্দি করে রেখেছে। তাই সে উদ্ধার হওয়ার জন্য কুমারকে অনুরোধ করে বলে 'যদি মোকে দেও হস্তে করহ উদ্ধার।'[৬১] এমন অনুরোধের কারণে তাজুল শ্যামদেও-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অবশেষে যুদ্ধে দেওকে পরাজিত করে রুহ আফজাকে নিয়ে তার পিতৃরাজ্য ফেরদৌস নগরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে রুহ আফজার প্রচেষ্টায় তাজুলমুলুক ও বকাওলী পরির সাক্ষাৎ ঘটে। এ সময় বকাওলীর মাতা জমিলাকে তাজুলের সাথে বকাওলীর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হলে 'পরি সঙ্গে মনুষ্য মিলনে কোথা হিত'[৬২]-কথাটি বলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।

বকাওলীর মাতার নিকট থেকে বিয়ের সম্মতি আদায় করার জন্য রুহ আফজা তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এক সময় তাজুলের চিত্রপট বকাওলীর মাতাকে দেখানো হলে তা দেখে জমিলা খাতুন মুগ্ধ হন। অবশেষে 'ধার্য কৈল্য কুমারকে কন্যা বিহা দিতে।'[৬৩] বকাওলীর পরিবার চিন্তা করে দেখে সামাজিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে যদি তারা এই বিয়েতে সম্মতি না দেন, তাহলে মেয়ে বকাওলীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ পরি কন্যা বকাওলী মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে কুমার তাজুলকে। তাই পারিপার্শ্বিক চিন্তা করে এই বিয়েতে সম্মতি দেন।[৬৪] সেইসাথে মেয়ের অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কুমার তাজুলের হস্তে কন্যা সম্পাদন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কাব্যের ভাষায়:

ভাবিলেন্ত রূপবন্ত কুলের কুমার।
কন্যায় হইয়া মগ্ন ভ্রমিছে সংসার ॥
এহারে না দিলে কন্যা জীবন সংশয়।
অন্য বর ন বরিব যদি দেব হয় ॥
এথভাবি জমিলায় কৈল্য অঙ্গীকার।
কুমারের হস্তে কন্যা পানিগ্র দিবার ॥[৬৫]

সম্মতি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অবশেষে পরি কন্যা বকাওলী ও তাজুলমুলুকের বিয়ের কার্য নানাকর্মযজ্ঞ এবং মহাধুমধামের সাথে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের পূর্বে বরকে সাজানোর কর্মযজ্ঞ চলে দীর্ঘসময়ব্যাপী। গোলাপ, আতর ও সুগন্ধি দিয়ে সুসজ্জিত করে বরকে নান্দনিক নানা উপকরণে প্রস্তুত করা হয়। যা সত্যিকার রাজপুত্রের অবয়ব সদৃশ সাজসজ্জা। বরের সর্বাঙ্গে যেন অলংকার শোভিত হতে থাকে। কাব্যের ভাষায়:

কুমার গোছল করে সুগন্ধি গোলাবাতরে,
বসিয়া সুবর্ণ সিঙ্গাসনে।
পরিকুলে জল ঢালে, কেহ কেহ শিরমলে,
কেহ রহে পৃষ্ঠের মাঞ্জনে।
কেহ মলে চন্দ্র মুখ, কেহ গলে কেহ বুক,
কেহ হস্ত চরণ যোগলে।[৬৬]

বিবাহের সার্বিক আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন ফিরোজ শাহা। 'ফিরোজ শাহায় করে বিবাহের কাজ।'[৬৭] বিয়েতে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যবাজনাও বাজানো হয়। ফিরোজ শাহা কন্যা সমর্পণ করে আশীর্বাদ বিনিময়কালে নতুন জামাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি একজন সচেতন ব্যক্তি ও পণ্ডিতজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র সম্পর্কে জান। তাই তোমাকে বেশি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে 'যতনে রাখিবা তারে প্রেমভাণ্ডে ভরি।'[৬৮] বিদায় পর্বের দৃশ্যটিও অনন্যতায় ধৃত। কাব্যের ভাষায়:

মোর কন্যা স্থাপ্য ধন দিলু তোমা হাতে।
প্রেমরসে বন্দি করি রাখিবা জগতে ॥
মোর ঘরে এই এক মাণিক্য উজ্জ্বল।
তাহা বিনে অন্ধকার হইব সকল ॥[৬৯]

কুমার তাজুল বকাওলীকে বিয়ে করে শ্বশুরালয় থেকে নিজ প্রাসাদে ফিরে আসে। এখানে এসে তাদের দিনযাপন চরম সুখে অতিবাহিত হতে থাকে। তাদের সংসারে এখন যেন সুখের আর কোনো অভাব নেই। তাদের দাম্পত্য নিয়ে আর কথা নেই। তারা এখন পৃথিবীর সুখি দম্পতিদের মতোই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। এখন তারা চিন্তামুক্ত ও আয়েশি জীবনের বাসিন্দা।

এরই মাঝে তাজুল ও বকাওলী পরির সুখস্বাচ্ছন্দ্য জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। অধ্যায়টির সৃষ্টি হয়েছে কেবল পরিকন্যা বকাওলীকে কেন্দ্র করে। অধ্যায়ের সূত্রে তাজুলমুলুক দেখতে পান বকাওলী পরি প্রতিরাতে অমরাপুরে অবস্থিত ইন্দ্ররাজার রাজ্যসভায় নৃত্যগীত করতে যান। একদা কৌতূহলী হয়ে কুমার তাজুলও যান বকাওলীর সাথে অমরাপুরীর ইন্দ্রসভায়। সেখানে মৃদঙ্গীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাজুল বকাওলী পরির নাচের সাথে তালেতাল মিলিয়ে মৃদঙ্গ বাজায়। বকাওলীর নাচ ও মৃদঙ্গীর বাজনায় ইন্দ্ররাজ খুশি হয়ে বর দিতে চাইলেন। এমন সুযোগে বকাওলী পুরস্কার হিসেবে রাজার কাছে মৃদঙ্গীকেই পেতে চান মর্মে নিবেদন করে। এমন সময়ে রাজা ছদ্মবেশ ধারণকারী মৃদঙ্গী বাদক তাজুলের প্রকৃত পরিচয় জেনে ফেলেন। তাজুলের পরিচয় জানার পর দেবলোকে নরের আগমনে ইন্দ্ররাজ সক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়ে বকাওলীকে অভিশাপ দেন। কাব্যের ভাষায়:

সিংহল দ্বীপেত রাজা চন্দ্র সেই নাম।

তাহাতে মঠের গৃহে কর গিয়া ঠাম ॥
দ্বাদশ বৎসর শিলা হইয়া থাকিবা।
জন্মান্তরে কুমার হরিষে তবে পাইবা ॥
এ বলি সিংহল দ্বীপে কন্যাকে ফেলিল।
অর্দ্ধ অঙ্গ শিলা হই মঠেত রহিল ॥[৭০]

অভিশাপের কারণে শাস্তি স্বরূপ তাজুলকে মঠে এসে অবস্থান করতে হয়। মঠে অবস্থানরত বকাওলীকে প্রতি রাতে সাক্ষাৎ দিতে হতো। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুমারও সিংহল দ্বীপে এসে অবস্থান নেন। সেখানে কুমারের নিকট কোনো টাকাকড়ি না থাকায় উরুদেশে গিয়ে নিজের শেষ সম্বল স্বরূপ গৃহীত মণিটি রাজবাড়িতে বিক্রয় করতে যান। মণি বিক্রয়কালে সিংহল রাজকন্যা চিত্রাবতী তাজুলের রূপ দেখে মুগ্ধ হন। এমনকি চিত্রাবতী তখন প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন-'চিত্রাবতী কন্যা চিত্ত করে ধড়ফড়।'[৭১] আহার ও নিন্দ্রা ত্যাগ করে তাজুলকে বিয়ে করবে বলে পণ করে বসে। চিত্রাবতী কুমারের প্রতি অনুরক্তা হলেও কুমার তার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। ফলশ্রুতিতে রাজার আদেশে মণি চুরির মিথ্যা অপবাদে তাজুলকে অভিযুক্ত করে বন্দি করা হয়। নিরূপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত কুমার বাধ্য হয়ে চিত্রাবতীকে বিয়ে করে মুক্তি পান। এর পর বার বছর পূর্ণ হলে বকাওলী কৃষক কন্যা হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করে যথাসময়ে তাজুলের সাথে মিলিত হন।

মুক্ত তাজুলমুলুক অবশেষে বকাওলী ও চিত্রাবতীকে নিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসে। সেখানে চারজন স্ত্রীকে নিয়ে সুখশান্তিতে জীবনযাপন করতে থাকে। এদিকে তাজুলের রাজ্যে তার এক বিশ্বস্ত অমাত্য ছিল, সেই অমাত্যের বহরাম নামে একজন পুত্র সন্তান ছিল। সেই বহরাম বকাওলীর বোন রুহ আফজার সাথে পরিচিত হয়ে প্রণয়ে আবদ্ধ হলে তাজুল ও বকাওলীর চেষ্টায় তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর হেমালার সহায়তায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বহরাম ও রুহ আফজাকে সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়। বসবাসের সুযোগ পেয়ে 'পত্নী সঙ্গে বহরাম রহে সেই স্থানে।'[৭২] পাশাপাশি দুটি উদ্যানে তাদের আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

গুলে বকাওলী কাব্যের অন্যান্য কবি

কবি নওয়াজিস খান ব্যতীত আরও অসংখ্য কবিসাহিত্যিক *গুলে বকাওলী* কাব্য প্রণয়ন করেছেন। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাব্য রচনার নিদর্শন মেলে। তবে যাঁদের *গুলে বকাওলী* রচনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের একটি তালিকা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।

সারণি[৭৩]

গদ্য/পদ্য	রচয়িতার নাম	গ্রন্থ	কাল নির্ণয়
উর্দু গদ্য	ইজ্জতুল্লাহ	গুলে বকাউলী	১১৩৪ হি. / ১৭২২ খ্রি.
পদ্য	মুহম্মদ মুকীম	গুল-ই-বকাওলী	১৭৬০-৭০ খ্রি.
	মুহম্মদ আলী	গুলে বকাওলী	আঠারো শতকের শেষার্ধ
	মুন্সী এবাদত আলী	গোলে বকাওলি ও তাজুল কুমারের পুথি	১৮৪০ খ্রি.

	উমারচণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র	গুলে বকাঅলি ইতিহাস	১৮৪৩ খ্রি.
	আবদুস শুকুর	গোলে বকাওলী	-
গদ্য	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	গোলে বকাওলী	১৯০৪ খ্রি.
	সৈয়দ আবদুল মান্নান	গুলে বকাওলী	১৯৪৯ খ্রি.
নাটক	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গোলে বকায়লি	১৮৭৮ খ্রি.
	কুঞ্জবিহারী বসু	গোলে বকাওলী	১৮৮১ খ্রি.

সারণির মাধ্যমে দেখা যায় অসংখ্য সাহিত্যিকের হাতে *গুলে বকাওলী*র কাহিনি প্রণীত হয়েছে। তবে যত সংখ্যক লেখকের হাতেই তা প্রণীত হোক না কেন? কেবল মুহম্মদ মুকীম ও কবি নওয়াজিস খান কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থটি শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। এছাড়াও অন্যান্য রচনাতে গল্পরস বা নাট্যরস পরিবেশিত হয়েছে মাত্র। আঙ্গিকগত কলানৈপুণ্য বা শিল্পকুশলতা সাফল্যে প্রদর্শিত নয়। শিল্পমূল্যের মাপকাঠি বিচারের নির্যাসে দেখা যায় নওয়াজিস খান ও মুহম্মদ মুকীমের কাব্যের কাহিনির উৎস একই সূত্রে গ্রোথিত। কারণ হিসেবে দেখা যায় উভয়ের আহরিত কাহিনিধারা অনুসৃত হয়েছে সবিশেষ মিলবিন্যাসের মধ্য দিয়ে। তবে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এই দুজনের আঙ্গিকগত পার্থক্য বিদ্যমান। মুকীমের কাব্যে প্রধানত আবেগাপ্লুত হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসাথে গল্পরসে মিশ্রিত হয়েছে গীতিরস। তবে গীতিরস মিশ্রিত হলেও বুদ্ধিবৃত্তির চাতুর্য উপেক্ষিত নয়। তিনি ছন্দশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংগীত শাস্ত্র ও হিন্দুমুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কেও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন।[৭৪] সে কারণে মুকীমের কাব্যে শিল্পগুণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্য ও আবেগের সুষমমিশ্রণ অনুভব করার মতো। আর বকাওলীর চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে শব্দের যোজনা ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, ফলে শিল্পস্বাদ আহরণ করা যায়।

কবিত্বশক্তি, শিল্পবোধ ও মনীষার বৈশিষ্ট্য

প্রথম *গুলে বকাওলী* কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে কবি নওয়াজিস খানের অবদান স্বীকার্য। তিনি আঠারো শতকের কবি হিসেবে কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য আজও সাহিত্যের অঙ্গনে নন্দিত।[৭৫] এ কাহিনির প্রথম রচয়িতা হিসেবেও তিনি সার্থক রূপকার। ফারসি 'গুলে বকাওলী' উপাখ্যান অবলম্বনে যে কজন লেখক কাব্যটি প্রণয়ন করে সাফল্য ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এ কাব্যের কাহিনির উৎস ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত হলেও মৌলিকতা প্রকাশের দিক থেকে তিনি মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।[৭৬] তবে তাঁর এই অনুবাদ কোনো আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তিনি আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাই দেখা যায় 'অনুবাদ সাহিত্যে হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ রীতি বড়ো একটা গৃহীত হয়নি। কবিরা মূলগ্রন্থকে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় পয়ার ত্রিপদীতে রচনা করে স্বল্পশিক্ষিতের মানসিক ভোজের অনুকূল খাদ্য পরিবেশন করেছেন।'[৭৭] সে কারণে বলতে হয় অনুবাদ হলো মূলানুগত নতুন সৃষ্টি। এই কবির অনুবাদকর্মটি ঠিক সে জাতীয়। রোমান্টিক কাহিনির রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে তিনি ঘটনার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাধন করেছেন। কাহিনি বর্ণনায় তিনি বৈচিত্র্য ও

নতুনত্ব আনতে পারেন নি। তবে বৈচিত্র্য এনেছেন ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে। কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে মূলত বিষয়বস্তুর পরিবর্তে অভিনব পরিচর্যা ও পরিযোজনার নির্যাস চিত্রণে।

কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য: কবি নওয়াজিস খানকে একজন শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হিসেবেও পাওয়া যায়। যা তাঁর এই কাব্যে প্রয়োগ হয়েছে। তিনি সুফিবাদ, ভারতীয় দেহতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, যোগতত্ত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[৭৮] সুফিবাদ বা অধ্যাত্মতত্ত্বের আবেদন প্রকাশের নিমিত্তে তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক ও রহস্যভেদ বর্ণনা করেছেন। সে কারণে কবির মানসধর্মের সুস্পষ্ট পরিচয় কাব্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠেছে। বিশেষত স্রষ্টার রহস্যভেদ উপস্থাপনে কাব্যে একইসাথে ধর্মজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মানুষ যে সৃষ্টির সেরাজীব, সে বিষয়ে কবির অবস্থান স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। কাব্যের ভণিতার ভাষায়:

প্রণমিএ সে প্রভুর সে মিত্র চরণ।
পরকালে যার হতে পাপ বিমাচন ॥
কৌটি কৌটি প্রণমিএ সে যুগল পদ।
যাহার তোপ এলে পরলোকে মুক্তি পদ ॥[৭৯]

সৃষ্টির সেরাজীব মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে চেয়েছেন প্রভুর পরিচয়। স্রষ্টাকে নিজের মধ্যে পাওয়া যাবে, অন্য কোথাও নয়। নিজের মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান। কবি এখানে সুফিতত্ত্বের ভাবাদর্শকে প্রতিভাত করতে চেয়েছেন। সুফিধর্ম হলো প্রেমবাদ। আর সে প্রেমবাদ হলো আল্লাহপ্রেম। সৃষ্টির প্রেমেই স্রষ্টার প্রেমের বিকাশ। মরণনদীর এপার ওপারে ব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই এ সাধনার সিদ্ধি।[৮০] কবি মনে করেন শুদ্ধ ও সরল মন দিয়ে স্রষ্টার অনুসন্ধান না করলে তাঁর সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

শুভাশুভ বর্ণণা: কবি নওয়াজিস খান সার্বিক পরিস্থিতি সহজে উপলব্ধি করতে পারতেন। সে কারণে কোনো কাজের শুভাশুভ আবেদন সম্পর্কে সহজে বলে দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। একজন জ্যোতিষী যেমন তাঁর বাণীবচনের মধ্য দিয়ে ভালোমন্দ সবকিছু বলতে পারেন, তেমনই কবি নওয়াজিস খান শুভাশুভ বলতে পারতেন। কাব্যের ভাষায়:

পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে পূর্ণতে ॥
এই পঞ্চ তিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয় ॥
সে সমে সঙ্গমে গর্ভ হইবেক পাত।
বাণিজ্যেতে মূলে নষ্ট হইব তাহাত ॥[৮১]

হিন্দুমুসলিম সম্প্রীতি অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনুরূপ ঐতিহ্য কবি নওয়াজিস খানের *গুল বকাওলী* গ্রন্থেও বিম্বিত হয়েছে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনির প্রসঙ্গ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপন করেছেন। এমন কি ইসলামি কিংবদন্তি ও কাহিনির অনুষঙ্গ সংযত ভাষায় ব্যবহার করেছেন। কাব্যের ভণিতার ভাষায়:

ইয়াকুব নবীর যেমন ইছুপ কারণ।

আঁখি শেষ করিলেক আশার দরশন ॥
আইউবে আপনা দুঃখ শরীরে সহিল।
তেনমতে শাহা দুঃখ ভুঞ্জিতে লাগিল ॥[৮২]

হিন্দু পুরাণখ্যাত প্রসঙ্গ তাঁর দৃষ্টিতে কাব্যটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে। তাই মুসলমান প্রসঙ্গের মতো হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় কথা তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। তিনি যখন 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থটি রচনা করেন তখন মঙ্গলকাব্য রচনার আবহ অবর্তমান ছিল না। সে কারণে দেবদেবীর প্রসঙ্গ কবি অবলীলাক্রমে বিম্বিত করেছেন তাঁর এই কাব্যে। উভয় ধর্মের একজন শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হিসেবেও তাঁর অবদানের কথা কাব্যে বিম্বিত হয়েছে। কাব্যের ভাষায়:

কুগ্রহ হইলে যার শত্রু হয় পিতা।
কুগ্রহে রাবনে হরে রামের বণিতা ॥
কুগ্রহে উপেন্দ্র দেবে নারী ভাসাইল।
শুভ পাই রতন কলিকা পুনি আইল ॥[৮৩]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার: ইংরেজি *Folkbelief* ও *Superstition*-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার গৃহীত হয়েছে।[৮৪] বৈচিত্র্যগত দিক থেকে বাঙালি জন্মগতভাবে অত্যন্ত সহজসরল এবং বিশ্বাসপ্রবণ একটি জাতি। আর এই বিশ্বাস একান্তই মনোজ বিষয় সম্পর্কিত। তাই যে কোনো ঘটনা বা বর্ণনা বাঙালির কাছে সহজে বিশ্বাসযোগ্য রূপ পেয়ে থাকে। এমন আবেদন কাব্যের বিভিন্ন ছত্রে স্থান করে নিয়েছে। বিশেষত প্রাত্যহিক কৃতকর্ম ও যাত্রাকালীন মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিষয়টি উল্লেখ করার মতো। এছাড়াও যাত্রাকালে শিয়াল, ধেনু, বৎস, ঘট দেখলে কী হতে পারে সে সম্পর্কেও কাব্যে বলা হয়েছে।[৮৫] যা আবহমান বাঙালির জীবনাচারের অন্তর্গত লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের প্রতিফলন। ভণিতার ভাষায়:

ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর ॥
ধেনু বৎস প্রসাবিলে বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উড়য় ॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ নৃপ গণকাদি সমুখে শোভন ॥
সদ্য মাংস দধি সুধা সরু ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত ॥[৮৬]

প্রবাদ-প্রবচন: লোকসাহিত্যের অসংখ্য শাখার মধ্যে প্রবাদপ্রবচন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় একটি শাখা। এই শাখার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক মনন ও মেধার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আজকের দিনেও এ শাখার আবেদন অক্ষুণ্ন রয়েছে। একসময় এগুলোর আবেদন ছিল খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানেও মানুষ এ সবরে মধ্য দিয়ে বদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করে মনের আকুতি প্রকাশ করতে চান। মানুষ যখন কোনো কথা সরাসরি বলতে পারেন না, বা বলতে পারা সম্ভব হয়ে ওঠেনা-তখন চতুরতার সাথে এগুলোর সাহায্যে মনের আকুতি প্রকাশ করে থাকেন। এগুলোর আবেদন বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ও চরম উন্নতির যুগে এসেও পাশকেটে যাওবার সুযোগ নেই। কারণ এগুলো হলো মানবমনের চিত্তাকর্ষক আবেদন। যেগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ কথা সহসায় প্রকাশিত হয়। তাই এগুলোকে অস্বীকার করার

উপায় নেই। কবি নওয়াজিস খানও অনুরূপ অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন *গুলে বকাওলী* কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। এগুলোর কয়েকটি নিচে উপস্থাপিত:

১. আয় বৃদ্ধ তোমা কহি শূনহ বচন।
২. জীবনের সারথি রাখিছে এক কায়া।[৮৭]
৩. সবচনে কহে বাক্য নহে ভিন্নাভিন।[৮৮]
৪. উত্তম বসন দেও অশ্ব গম্য বর।[৮৯]
৫. বৃদ্ধ বাক্য অধিক প্রত্যয় হইল মনে।[৯০]
৬. সুখের দিবস জান সেকেন্ড সমান।
দুঃখের দিবস শত অব্দ পরিমাণ ॥[৯১]

নীতিকথা: কাব্যের কাহিনির অভ্যন্তরে তিনি মাঝে মাঝে নীতিকথার মধ্য দিয়ে কিছু উপদেশ বা শাস্ত্রীয় বাণীবচনকে সুভাষণ[৯২] বা এপিগ্রামে রূপ দিয়েছেন। এমন বাণীবচনের মধ্যদিয়ে 'গুলে বকাওলী' কাব্যে কবির আদর্শবাদী মননের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেছে। এ কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি সুভাষণের উদাহরণ সংগত কারণে তুলে ধরা হলো। সুভাষণের উদাহরণ-

ক্ষমার মাহাত্ম্য বিষয়ক: যেবা ক্ষমাশীল হৈব, আদি অন্তেরক্ষা পাইব,
অ-ক্ষেমার নষ্ট সর্বকাজ।[৯৩]

সুখদুঃখ বিষয়ক : যার হেতু যেবা যায়, অবশ্য তাহাতে পায়,
দুঃখ সুখ মিলে দুই দিন।[৯৪]

প্রেম বিষয়ক : প্রেমডোরে প্রাণবন্দি হইছে যাহার।
কদাপি শমনে প্রাণ না হরএ তার ॥[৯৫]

জন্মভূমি বিষয়ক : মোর জন্মভূমি জান শর্কস্থান দেশ।
সুখের নাহিক অন্তকি কহি বিশেষ ॥[৯৬]

মানবচরিত্র সম্পর্কিত : উত্তম লোকেরে সবে করএ আদর।[৯৭]
সংসার চরিত্র বুঝ কিবা আত্মপর।
ধনের তরাজু দিয়া তৌলয় আদর ॥[৯৮]

লোকখাদ্য: বাঙালি চিরকালই খাদ্যভোজনে বৈচিত্র্য প্রয়াসী। কেবল ভাত, মাছ, দুধ, ফলমুল আর মিষ্টান্নতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এসবের সাথে খাদ্য তালিকায় আরও যুক্ত হয় বত্রিশ প্রকার আহারে ব্যঞ্জন।[৯৯] এছাড়াও খাদ্য তালিকায় ঘি একটি পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। সে কারণে বাঙালি নারীর রন্ধন প্রণালীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ঘিয়ের যত্রতত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মোটকথা ভোজনপ্রিয়তায় লোকাচার বা দেশাচার বাঙালির আজন্মলব্ধ সংস্কৃতি। গ্রামবাংলায় একজন মানুষ অপর আর একজনের বাড়িতে কারণবশত বা কোনো কারণ ছাড়া প্রবেশ করলে হাতের কাছে যা পান তা দিয়ে আদর আপ্যায়ন করানো হয়। এটি গ্রামীণ লোকসমাজের অভ্যন্তরীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পরম্পরাগত আবেদন। যা প্রাচীনকাল থেকে আবহমান বাংলায় বহমান। কবি নওয়াজিস খান লোকসংস্কৃতির অংশ বিশেষ দেশাচারের চিত্রসদৃশ লোকআপ্যায়নে ঋদ্ধতায় মানবিকতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। ফলে একজন প্রাজ্ঞ শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যের ভণিতাতে রয়েছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত। কাব্যের ভণিতার ভাষায়:

১. মিশ্রী কন্দ দুগ্ধ ঘৃত, তণ্ডুল সঙ্গ মিশ্রিত,

সুধারস সুগন্ধি পূরণ।
আনিয়া তবক ভরি, সকল সমুখে জুড়ি,
বোলে এবে করহ ভোজন।[১০০]

২ দধি দুধ শর্কেঘৃত, মিশ্রি কন্দ সুধামৃত,
বাতাসা মণ্ডের বহুছন্দ।
নানারূপে পাকোয়ান, নানান মধুর নান,
প্রচারিতে আমোদ সুগন্ধ।[১০১]

৩. মিশ্রি কন্দ সুধা স্বাদ পাইল পূর্ণিত।[১০২]

৪. যথ লোক আছিলেক পাত্রের সঙ্গগতি।
সকলে ভোজন কৈল্য সর সে সম্প্রতি ॥[১০৩]

৫. মিশ্রি কন্দ ঘৃত দুগ্ধ সুধা শাত্রু দধি।[১০৪]

৬. ঘৃত সুধা শর্করাদি যথামৃত রীত।[১০৫]

রূপতৃষ্ণা: কবি নওয়াজিস খানের *গুলে বকাওলী* কাব্যে রূপতৃষ্ণাকে পাওয়া যায় প্রেরণার উৎস হিসেবে। সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ছিল সে যুগের মানুষের প্রত্যাশা। জীবনকে যথার্থ চিত্রে দাঁড় করার জন্য তারা বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত নদনদী, গিরিঅরণ্যেও বিচরণ করতে দ্বিধা করেন নি। কাব্য পাঠে দেখা যায় রূপতৃষ্ণার কারণে কাব্যের নায়ক তাজুলমুলুককে ঘটনার প্রেক্ষিতে একাধিক বিয়ে করতে হয়েছে। মূলত নায়কের রূপের কারণে পরপর চারটি সুন্দরী রমণী তার জীবনে এসেছে। সাধারণ ঘরের পালিত কন্যা থেকে শুরু করে পরি ও রাজকন্যা পর্যন্ত নায়কের জীবনে সংগ্রাম ছাড়াই অনায়াস প্রাপ্তি ঘটেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেখানে নায়ক তার নায়িকাকে পাওয়ার জন্য জীবনবাজি রেখে মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াতে হয়েছে। এ কাব্যের ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ অন্যান্য রোমান্টিক কাব্যের তুলনায় *গুলে বকাওলী* কাব্যের কাহিনির আবেদন যেন অধিক রোমান্সধর্মী হয়ে ওঠেছে।[১০৬] এখানে নায়ককে ঘটনার প্রেক্ষিত থেকে উত্তরণের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে হয়েছে। কাব্যের ভাষায়:

কন্যা কুমার গলে ধরিল তখন।
গলাগলি ক্ষেনেক আছিল দুইজন ॥
দোহ অঙ্গ দহে বিচ্ছেদের শরানলে।
এ হৈল পাখালি আঁখির বৃষ্টি জলে ॥[১০৭]

কাব্যের নায়ক তাজুল যে চারটি রমণীকে বিয়ে করেছেন তার জন্য তাকে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি, বরং নায়িকারাই তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থা ও ঘটনার কারণ হিসেবে পাওয়া যায় রূপতৃষ্ণা। এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকা বকাওলী পরি কেবল রূপতৃষ্ণার কারণে পরিরাজ্য বকাওলী উদ্যান থেকে শর্কস্তান পর্যন্ত স্বেচ্ছায় এসেছে। তাই দেখা যায় রূপজমোহ বা রূপতৃষ্ণা এ কাব্যে যথার্থ আবেদনে পর্যবসিত হয়েছে।

১ কাব্যমূল্য: আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে *গুলে বকাওলী* কাব্যের কাব্যমূল্য বিচার ও বিশ্লেষণ করা যথোপযুক্ত নয়। একটি যুগ ছিল যখন রোমান্টিক ভাবাদর্শকে সামনে রেখে কবিগণ কাহিনিকাব্য রচনা করে বাঙালি মুসলমান সমাজের রীতিনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেন। সে ধারার তাগিদে তাঁরা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সেখানে কাব্যমূল্য বা শিল্পমূল্য ততটা গুরুত্ববহ ছিল না। এমন কারণের জন্যই কাব্যটির কাব্যমূল্য

উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল নয়। সেদিক থেকে আধুনিক কবি সাহিত্যিকের সাথে তুলনার বিচারে তিনি প্রথম সারির কবি হিসেবে তুলনীয় নন। তবে তাঁর তুলনা চলে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচয়িতা হিসেবে। এ বিষয়ে ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে *গুলে বকাওলী* গুণহীন নয়।'[১০৮] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ যে রোমান্টিক কাহিনি কাব্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারার একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন কবি নওয়াজিস খান। ফারসি ভাষার রচিত একটি কাহিনিকে নিয়ে বাঙালি পাঠকের মননের উপযোগী করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, সেটি প্রতিভার সার্থক দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২ চরিত্র চিত্রণ: মধ্যযুগের অন্যতম কবি নওয়াজিস খানের *গুলে বকাওলী* কাব্যের নায়ক তাজুল ও বকাওলী পরি চরিত্র দুটি ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলো তেমনভাবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সফল ও বিকশিত হয়ে ওঠেতে পারেনি। নায়ক-নায়িকাকে সাধারণত সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে হয়। আলোচ্য কাব্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে তেমন সংগ্রাম ও প্রতিকূলতা অনুপস্থিত। তবে প্রেম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নায়ক চরিত্র তাজুলমুলুকের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রচেষ্টা পাঠকের নজর কাড়তে পেরেছে। বিশেষত বাঙালি সমাজের সংস্কারবোধের বৈচিত্র্যে নায়ক তাজুলমুলুকের চরিত্রটি গড়ে ওঠেছে।[১০৯] আর কাব্যের নারী চরিত্রগুলো পুরুষ চরিত্রের আদর্শকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। সন্তানহীনা হেমালা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য দৈত্য হলেও কন্যা প্রতিপালনের দিক থেকে আচরণগত বৈশিষ্ট্যে একেবারে বাঙালি নারীসুলভ ভাবভঙ্গিতে বিশ্বাসী ছিল। আবার কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে বকাওলীর মাতা জমিলার বিলাপ স্নেহকাতর বাঙালি নারীর চিরন্তন রূপ হিসেবে ধরা পড়েছে। কাব্যের ভাষায়:

তবে রানী জমিলা খাতুন গুণবতী।
সজল নয়ানে কহে জামাতার প্রতি ॥
আজি মোর ঘট হন্তে প্রাণী নিস্বরিব।
শূন্য ঘট বিনু প্রাণে কেমতে রহিব ॥[১১০]

কন্যার সুখশান্তি ও অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কন্যা বিদায়কালে আবহমান বাংলার মায়েরা যেমন করে নতুন জামাইকে অনুনয় বিনয় করে কথা বলে থাকেন, তারই একটি চিত্র জমিলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে ওঠেছে। এ দিক থেকে জমিলা চরিত্রটি জীবন্ত। এছাড়াও এই কাব্যের অপর এক জীবন্ত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে রুহ আফজা চরিত্রটি। তাজুল ও বকাওলী পরির প্রণয়কে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য কাব্যে তার ভূমিকা অনন্য। সে বকাওলীর মাতা জমিলার সাথে ঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বিয়ের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছে। এই বিয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের মতই। *গুলে বকাওলী* কাব্যের কাহিনিতে ডাকিনী, যোগিনী, অপ্সরা, পরি ও দৈত্যের চরিত্র চিত্রিত হলেও পরিবেশ ও চরিত্রনির্মাণ পরিকল্পনায় কবি বাঙালিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেন নি।[১১১] তবে কবি চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকে অধিকাংশ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে সংগ্রামী মনোভাব প্রদর্শন করতে পারেন নি। তবে কবি তাঁর এ কাব্যে নৈতিকতা ও আদর্শকে যথার্থভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। সে কারণেই চরিত্র পরিকল্পনার সার্বিক বিচারে পরিমার্জিত ভাষা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি এবং সচেতন শিল্পবোধ তুলে ধরার ক্ষেত্রে কবি

পেয়েছেন গৌরবের মুকুট। বলা যায় চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে কাব্যটিতে বিশেষ সাফল্য অনুপস্থিত। তবে এটুকু বলা সংগত যে, কবি আঠারো শতকের বাঙালি মুসলিম সমাজের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে সময় ও যুগের ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩ ভাষা ব্যবহার: ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে কবি নওয়াজিস খানের শিল্পকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভাবসমৃদ্ধ ভাষা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করে কাহিনির মধ্যে গতি সঞ্চার করতে পেরেছেন। মধ্যযুগের দুর্বোধ্য ভাষার বেড়াজালের মধ্যেও যেভাবে তিনি এ কাব্যে ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, সে ভাষায় অনায়াসে কাব্যস্বাদ আস্বাদিত হয়। এছাড়াও বাংলা ভাষায় যত সংখ্যক *গুলে বকাওলী* কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে নওয়াজিস খানের এই কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল কথাটি বলা চলে। কাব্যের ভাষা:

এ ভাবি কুমারে চলে নিজ কার্য আশে।
শুভ যার ভাগ্য তার অধি প্রকাশে ॥[১১২]

শব্দ প্রয়াগ: কবি নওয়াসি খানের কবিকৃতির অন্যতম সাফল্য যথাযথ শব্দ নির্বাচন করা। কারণ যথাযথ শব্দ নির্বাচন করতে না পারলে শব্দের মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয় না। এ বিষয়ে আজহার ইসলাম বলেন, 'নওয়াজিস খানের বর্ণনায় ঘটা আছে এবং সে–বর্ণনায় কবি যে সংস্কৃতবহুল তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক।'[১১৩] তিনি যথার্থ শব্দ নির্বাচন করে চমৎকার সুরঝংকারের সৃষ্টি করেছেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি একই শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে চরণে গতির সঞ্চার করেছেন। শব্দ ব্যবহারের দিক থেকেও তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ কাব্যে কবি কতিপয় নতুন ও অপ্রচলিত শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন। সেগুলো-চিত্রকারী (চিত্রাঙ্কন অর্থে), উপকান্ত (নাগর), খেলিগর (খেলোয়াড়), ভাবানল (প্রেমানল), ঊর্ধ্ব হেঁট (উঁচু নীচু), বালেম্বু (প্রেমাস্পদ), অকুমারী (অবিবাহিত), আরতি (আকাঙ্ক্ষা), মনঘোর (স্মৃতিবিভ্রম), চিকিৎসা (চেষ্টা) প্রভৃতি উল্লেখ্য। আবার দু'একটি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সেগুলো হলো-মিলাইতে (মলে) এবং লগে (সঙ্গে) ইত্যাদি।

৪ ছন্দ ব্যবহার: বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে ছন্দে ছিল কবিগণের একমাত্র অবলম্বন, সে ছন্দের নাম পয়ার। এই পয়ার ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণ তাঁদের কাব্যকবিতা রচনা করতেন। পয়ার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পয়ারের প্রথম চরণের শেষে এক দাড়ি এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে দুটি দাড়ি চিহ্ন থাকে। যা মধ্যযুগ পর্যন্ত ছিল উজ্জ্বল বৈচিত্র্যে অনন্য। এই উজ্জ্বল ও অনন্য ছন্দে 'গুলে বকাওলী' কাব্যটি রচিত হয়েছে। ছন্দ ব্যবহারের দিক থেকেও কবি নওয়াজিস খান কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতার ভাষায়:

বোলে তোমা শির কেশ/সজল নিন্দিত। ৮+৬
সিঁথি পাতি মধ্যে যেন/সিন্দুর আদিত ॥ ৮+৬
বাল্য চন্দ্র জিনি ভাল/তাহাতে টিকল। ৮+৬
ক্ষেণে ক্ষেণে বিন্দি শোভা/ললাট উজ্জ্বল ॥[১১৪] ৮+৬

মধ্যযুগের জনপ্রিয় ছন্দ পয়ার শ্রেণিবিভাগ অনুসারে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত।[১১৫] অনুরূপ বিন্যস্ত প্রকারভেদের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয় কবি নওয়াজিস খানের *গুলে বকাওলী* কাব্যটির ছন্দবিন্যাসে। তবে গ্রন্থটির সিংহভাগ অংশই তিনি 'প্রবহমান পয়ার' ছন্দে প্রণয়ন করেছেন। আর মাঝে মাঝে অংশ বিশেষ তিনি প্রণয়ন করেছেন 'রাগ দীর্ঘ ছন্দ' ও 'বিশাখ পয়ার' ছন্দে। আধুনিক বাংলায় এটিকে অক্ষরবৃত্তের অসমপার্বিক ত্রিপদী ছন্দ বলা হয়ে থকে। কাব্যে প্রযুক্ত 'রাগ দীর্ঘ ছন্দে'র ব্যবহার:

কুমারী বিলাপ করে, নিত্য প্রভু নাম স্মরে,
বোলো মোরে কর পরিত্রাণ।
কি দোষ করিছি আমি, কেন ক্রুদ্ধ হৈলা তুমি,
দুঃখের সমুদ্রে দিলা স্থান ॥[১১৬]

৫ অলংকার প্রয়োগ: যেসব উপাদান কাব্যের অবয়বকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে সেগুলোই কাব্যের অলংকার। তাই কাব্যের অলংকার বাইরে থেকে আরোপিত কোনো উপকরণ বা উপাদান নয়। এগুলো কাব্যের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কবি নওয়াজিস খান এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গির বিশ্লেষণে অলংকার শাস্ত্রের মতই নানাপ্রকার অলংকারের প্রয়োগ করেছেন।[১১৭] যেখানে অনেক কথা বলার দরকার সেখানে তিনি একটি মাত্র উপমা অলংকার প্রয়োগ করে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত রূপ দান করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলংকারের ব্যবহার বেশ স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে। কাব্যের ভাষায়:

উপমা : লাঠির প্রহারে গদা হইব খান খান।[১১৮]
মোর সম প্রেম দুঃখী নাহি ত্রিভুবন।[১১৯]
চন্দ্রসূর্য যেহেন হইল দেখাদেখি।[১২০]
সেই পুষ্প আনিয়াছি দেখ মোর হাতে।[১২১]
উৎপ্রেক্ষা : প্রেমের সমুদ্র জান অধিক অগাধ।
ডুবিলে মুকুতা ঘটে ভাসিলে প্রমাদ।।[১২২]
রূপক : উদ্যান সমুখ পন্থে চলিল কুমার।
চৌদিকে দেশের লোকে আইস দেখিবার।।[১২৩]

যমক অলংকার: কবি নওয়াজিন খান কেবল অলংকার শাস্ত্রের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক অলংকার প্রয়োগ করে থেমে থাকেন নি। কাব্যের মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গ, ধ্বনিমাধুর্য বা ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টির নিমিত্তে সুরের ঝংকারও সৃষ্টি করেছেন। আর সুরের ঝংকার সৃষ্টি করার জন্য যমক অলংকারের যথেচ্ছ প্রয়োগও ঘটিয়েছেন।[১২৪] যমক অলংকারের ব্যবহার:

ত্রিজগ মালিক প্রভু, সঙ্গী কেহ নাই প্রভু,
যাকে চাহে সমর্পে সংসার।
যাকে চাহে দেশ হরে, যাকে চাহে নষ্ট করে,
যাকে চাহে মহিমা অপার ॥
দিন হস্তে সুরজনী, রাত্রি হস্তে অহমনি,
মৃত হস্তে জীবন সঞ্চারে।[১২৫]

অনুপ্রাস অলংকার: যমক অলংকারে মতো অনুপ্রাস অংকারের সফল প্রয়োগ করে শৈল্পিকতার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে পেরেছেন। একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বাক্যের মধ্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি হয়। 'গুলে কাওলী' কাব্যে এ অলংকারের সফল প্রয়োগ হিসেবেও দৃষ্টান্ত মেলে:

১. সিসেত সিন্দুর যেন প্রভাতে সুর।[১২৬]
২. কোটি কোটি যদি করি প্রভুর শোকর।[১২৭]
৩. মনে মনে হেন কহি গেলেক সাক্ষাত।[১২৮]
৪. অন্যে অন্যে গলে গলে লইলেক ঘ্রাণ।[১২৯]

৬ রসবোধ: সাহিত্যে 'রস' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আস্বাদন। এটি সাহিত্য বিচারে এমন একটি অনুষঙ্গ সেখানে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উপস্থিতিতে মনের ভাব ও কল্পনাকে সচেতন কাব্য পাঠকের কাছে আস্বাদন যোগ্য করে তোলে। কবির কাব্যজগৎ বা কল্পলোক নির্মিত হয় শব্দার্থব্যঞ্জনা ও ধ্বনিতরঙ্গ সহযোগে। পাঠক সেই কাব্য পাঠ করে কবির কল্পলোকের সংস্পর্শে যে আনন্দ ব্যঞ্জনার সন্ধান পান সেটিই রস। কবি নওয়াজিস খান তাঁর *গুলে বকাওলী* কাব্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও সমান আবেদন নিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৩০] তাঁর রসবোধ ভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। এ বিষয়ে রাজিয়া সুলতানা বলেন, 'কবির স্বকীয়তা বিষয়বস্তুতে নয়–রসের নতুন প্রকাশে।'[১৩১] কাব্যের ভাষায়:

হরিরাদি কিনিকন, মসর্জর সুবসন,
সকলে সাজায় কুমাররে।
পেরাইল অলঙ্কার, গলে মণিমুক্তা হার
সুর্ণপুষ্প দিল শির পরে।
হস্তে নবরত্ন দিল, বাজুবন্ধ চড়াইল,
কোটি মণিমুক্তা সপ্ত লহর।
করাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী দর্পণ হস্তেত করি,
সোর্ণ পাংখা লইয়া গোচর।[১৩২]

৭ নাটকীয়তা: কবি নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাওলী' কাব্যে চমৎকার একটি প্রণয়কাহিনি রয়েছে। এই প্রণয়কাহিনিতে গতি ও জীবন্তরূপ আনয়নের জন্য যেসব চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব চরিত্রের মুখে ভিন্ন ভিন্ন সংলাপও সৃজিত হয়েছে। সেইসাথে ঘটনার আকস্মিকতা, উত্থান ও পরিণতিতে নাটকীয় উপাদান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে। যা নাটকের প্রকরণগত শৈলী ও বিন্যাসকৌশলের প্রতিরূপ দৃশ্য অবলোকন করা যায়।[১৩৩] কাব্যের কাহিনির একাগ্রতা দর্শককে নাট্যভঙ্গির নির্যাসে সবিমোহিত করে। জ্যোতিষী কর্তৃক নিষেধ সত্ত্বেও বাদশার মৃগয়া গমনে সন্তানের মুখ দর্শন, সেখানে দৃষ্টিশক্তি হারানো, বকাওলী ফুল সংগ্রহ, সংগৃহীত ফুল হস্তগত করে নেওয়া, ফুল সংগ্রহ করতে গিয়ে কাব্যের নায়ক তাজুলমুলুকের একাধিক ঘটনায় নিপতিত হওয়া, আবার বিভিন্ন ঘটনা থেকে উত্তরণ এবং কারণবশত একাধিক বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়গুলো নাটকীয় গতিরঙ্গকে স্পর্শ করতে পেরেছে। নাটকীয় উপাদান না থাকলে এ কাব্যের কাহিনি দর্শকদের মনের অভাব পূরণ করতে পারত না। তাই কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কাহিনিতে নাটকীয় উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছে কেবল সমৃদ্ধির পথে সার্থকতাকে স্পর্শ করার জন্য।

কাব্যিক সমালোচনা: কবি নওয়াজিস খান কর্তৃক প্রণীত *গুলে বকাওলী* কাব্যে সার্থকতার দিক থেকে সার্বিক সাফল্য থাকার পরেও পূর্ণ সমাদর পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে আধুনিক পাঠকের কাছে প্রত্যাশা পূরণের দিক থেকে স্বল্পবিস্তর শূন্যতা উপলব্ধি হতে চায়। আর এই শূন্যতার প্রধান কারণ যুগবিভেদ। কেননা যুগে যুগে সাহিত্যের কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসেবে যুক্ত হয় আবেগ ও চিন্তার নতুনত্ব। ফলে রুচির বদল হয়। পরিবর্তনের এমন ধারা ছাড়াও সাহিত্যের একটি শাশ্বত রূপে আছে, যে রূপ ও রুচির কখনো বদল হয় না। এটি সাহিত্যের আদি ও অকৃত্রিম রূপ। এই আদি ও অকৃত্রিম রূপের কারণে কালিদাস, বঙ্কিম, মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতি সাহিত্যিক অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন। সবশ্রেণির সাহিত্যিক সুন্দর সৃষ্টির আরাধনায় কাজ করেন, আর এই আরাধনার অন্যতম অবলম্বন হলো প্রকাশভঙ্গি। এই প্রকাশভঙ্গির কারণেই সাহিত্যিকের সৃষ্টি অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে কবি নওয়াজিস খানের কাব্যটিতে বক্তব্যে কিছুটা অনায়াস বাহুল্য প্রবেশ করেছে কথাটি বলতে হয়। জন্মমৃত্যু ও জগৎ জীবন সম্পর্কে কবির বক্তব্য উপস্থাপনায় কাহিনিতে মন্থরতা ও শ্লথগতি যুক্ত হয়েছে। আবার কাব্যের কাহিনি পাঠে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি অনুমিত হয়। কাব্যের শেষাংশে রুহ আফজার মন্ত্রপাঠ ও এর মাহাত্ম্য বর্ণনা পর্বটি ছিল পাঠকের কাছে যেমন কষ্টকর, তেমনই পীড়াদায়ক। এছাড়াও এ কাব্যের একটি পর্বে পুরুষের নারীরূপ ধারণ, পরবর্তীতে পুনরায় পরুষ চরিত্র রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি রূপ কথার মতই মনে হয়। যা অতিলৌকিক হিসেবে পাঠকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। হয়তো মূল অংশে ঘটনাটি ছিল, তাই কবি নওয়াজিস খান তাঁর এই অনুবাদ কাব্যে সেটি এড়িয়ে যাননি। এ ক্ষেত্রে কবি তাঁর সংযোজন ও বিয়োজনের মাত্রাকে যুক্ত করতে পারতেন। অবশ্য কাব্যবিচারে এসব ত্রুটিবিচ্যুতি একেবারে গৌণ। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের আবেদন নিয়ে গ্রন্থটি কতটুকু সাফল্যে দণ্ডায়মান, এর উত্তরে একবাক্যে বলতে হয় এটির সাফল্য অনিবার্যতায় ধৃত। নওয়াজিস খান যদিও বড় প্রতিভাধর কোনো কবি ছিলেন না, তবে সে যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি সাধারণও নন।[১৩৪] তাই সার্বিক বিচারে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য 'গুলে বকাওলী' যে প্রাণহীন ও পরিচর্যাহীন কোনো গ্রন্থ নয়, সে কথাটি দৃঢ়ভাবে বলা যায়।

তথ্যসূচি:

---

১. সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা: বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৫৮), পৃ. ৫

২. আজহার ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৩৪

৩. সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪. আজহার ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৫. ড. ওসমান গনী, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি* (কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৯), পৃ. ৭৫

৬. বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা: শ্যামা প্রেস, ১৩৬৭), পৃ. ১৫৪

৭. মধ্যযুগের কবিগণ হয়তো তাঁদের বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন যে বাস্তবজীবনের অনেক অভাব পূরণ করে সাহিত্য; এবং সেই সাহিত্যের ধারাটি যদি রোমান্স রসে বেগবান হয়, তবে সেই রস পান করে সাধারণ মানুষ বাস্তবতার

রূঢ়তাকে ভুলতে পারে। তাই মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের সাহিত্যধারায় একদিকে যেমন রোমান্স সৃষ্টির সার্থকতা লক্ষ্য করি, অন্যদিকে প্রণয়জীবনের আকুতি ও মিলনবিরহের মধ্যে মানবীয় জীবন মহিমার স্বভাবসুন্দর স্পন্দন অনুভব করি। আজহার ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ.৭৫-৭৬। বাঙালি মুসলমানদের আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৯১-১৪১০) 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যটি প্রাচীনতম। সগীর শ্রোতৃমণ্ডলী ও পাঠকবর্গকে আনন্দ দেওয়ার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বাংলার প্রাচীনতম কাহিনিকাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' লিখে যুগের উদ্বোধন করেছিলেন। কাব্যটির মধ্য দিয়ে তিনি সে যুগের যবনিকা উন্মোচন করেন। পরবর্তীতে তাঁর সৃষ্টিকৃত মঞ্চে আরও প্রতিভাশালী অভিনেতার আগমন ঘটে। কাব্যটি রচনা করে শিল্পসুষমামণ্ডিত মুসলিম কাহিনির প্রচার ও প্রসারে সমাজে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সষ্টি হয়েছিল তা, ভারতীয় কাহিনিকে বাংলাসাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করে তোলে। লক্ষ্য করার বিষয় বাংলা ভাষায় ভারতীয় কহিনির এই যে, সাহিত্যিক মর্যাদা দান-এমন একটা ব্যাপার বাংলার মুসলমানদের হাতেই ঘটেছে।

৯. গোলাম সাকলায়েন, *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭), পৃ. ৪৭। দোভাষী সাহিত্যটি কেবল নামে দোভাষী। কেননা দুটি ভাষারও বেশি ভাষায় এই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রি. সময়ে বাংলা, হিন্দি, তুর্কি এবং আরবি, ফারসি শব্দ মিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ কাব্য রচিত হয়েছিল। রচিত এমন কাব্যগুলোই দোভাষী সাহিত্য নামে পরিচিত। দোভাষী সাহিত্য পুথি সাহিত্য নামেও পরিচিত। সাহিত্যগুলো অলৌকিকতাপূর্ণ বীরত্ব বা প্রেমকাহিনি নিয়ে রচিত। দোভাষী কাব্য রচয়িতাদের বলা হয় শায়ের। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এ ধারার সূত্রপাত হলেও আধুনিক যুগের কিছুটা সময় পর্যন্ত এ শাখার অস্তিত্ব ও প্রভাব ত্রিয়াশীল ছিল। পুথি সাহিত্যের নাম নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ এ শাখাকে বটতলার পুথি বলতেন। তবে ড. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. দীনেশচন্দ্র সেন এ ধারার কাব্যকে পুথি সাহিত্য বলেছেন। আবার কেউ কেউ এ শ্রেণির সাহিত্যকে আরবি, ফারসি শব্দের মিশ্রণজনিত কারণে দোভাষী পুথি সাহিত্য নামেও নামকরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, বাংলা, হিন্দি, তুর্কি, আরবি, ফারসি শব্দের সংমিশ্রণে দোভাষী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

১০. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪), পৃ. ১১-১১৬। দোভাষী সাহিত্যকে বিশেষ ভাষারীতির কাব্য হিসেবে গত একশ বছরে নানাভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনোটি সন্তোষজনক নয়। লংয়ের পুস্তিকা তালিকায় এই ভাষাকে মুসলমানী ভাষা ও এই ভাষায় রচিত কাব্যকে মুসলমান বাংলা সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এ ভাষা বাঙালি মুসলমানের কথ্যভাষা হিসেবে কতদূর ব্যাপকতা লাভ করেছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে।

১১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-১ম খণ্ড* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৯৯), পৃ. ২১৬

১৩. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, নওয়াজিস খান প্রণীত, *গুলে বকাওলী* (ঢাকা: বাংলা একডেমী, ১৯৭০), পৃ. ১

১৪. অধ্যাপক শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান* (চট্টগ্রাম: জিলা কাউন্সিল, ১৯৬৫), পৃ. ৭০

১৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৬. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, নওয়াজিস খান প্রণীত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৭. An Unpublished inscription-Vol ix, No 21864, Journal of the Asiatic Society of Pakistan.

১৮. অধ্যাপক শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৯. *তদেব*, পৃ.৭০।

২০. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, নওয়াজিস খান প্রণীত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২১. *তদেব*, পৃ.৫-৭।

২২. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ৫ম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৩৩০

২৩. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৩), পৃ. ২৪৮

২৪. কবি নওয়াজিস খান 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো হলো-'গীতাবলী', 'বয়ানাত', 'প্রক্ষিপ্ত কবিতা', 'পাঠান প্রশংসা' ও 'জোরওয়ার সিংহ কীর্তি'। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

২৫. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য* (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিণ, ১৩৭২), পৃ. ৩৭
২৬. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, নওয়াজিস খান প্রণীত, গুলে বকাওলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩
২৭. *তদেব*, পৃ.২
২৮. শেষ ইজ্জতুল্লাহ নামের সাথে 'বাঙালি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর আত্মপরিচিতিতে লিখেছেন, আম্মাবাদ আবদুর রাজি-রহমতুল্লাহে মাতা আলী শেষ ইজ্জতুল্লাহ বাঙ্গালী বর জমায়েরে খেরদে বাঙ্গালী শখনওয়ার ওয়া শখনওয়ারানে দানিশ বারোজে রেশন মী সা'জাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাণ্ডুলিপি নং-এইচ, আর/৬৬, পৃ. ৭
২৯. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৩০. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৩১. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, নওয়াজিস খান প্রণীত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৩২. *তদেব*, পৃ. ২
৩৩. *তদেব*, পৃ. ২
৩৪. ড. জ্ঞানচন্দ্র জৈন, *উর্দু কি নসরী দাস্তানী*, ১৯৫৪ সংস্করণ, পৃ. ১৬১-১৬২
৩৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা-২য় খণ্ড*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪), পৃ. ২৫২
৩৬. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৩৭. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৩৮. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩৯. *তদেব*, পৃ. ৯
৪০. *তদেব*, পৃ. ৯
৪১. *তদেব*, পৃ. ৯
৪২. *তদেব*, পৃ. ১০
৪৩. *তদেব*, পৃ. ১২
৪৪. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য*, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৪৫. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪৬. *তদেব*, পৃ. ৭০
৪৭. *তদেব*, পৃ. ৭১
৪৮. *তদেব*, পৃ. ৭০
৪৯. *তদেব*, পৃ. ৭৬
৫০. *তদেব*, পৃ. ৭৬
৫১. আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ২৪৪।
৫২. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৫৩. *তদেব*, পৃ. ১৬৩
৫৪. *তদেব*, পৃ. ১৬৮
৫৫. *তদেব*, পৃ. ১৬৮
৫৬. *তদেব*, পৃ. ১৭৭
৫৭. *তদেব*, পৃ. ১৭৭
৫৮. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য*, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫৯. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৬০. *তদেব*, পৃ. ১৮৬
৬১. *তদেব*, পৃ. ১৮৮
৬২. *তদেব*, পৃ. ১৯৭
৬৩. *তদেব*, পৃ. ২০৮
৬৪. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য*, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৬৫. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

৬৬. *তদেব*, পৃ. ২১১
৬৭. *তদেব*, পৃ. ২০৯
৬৮. *তদেব*, পৃ. ২২৫
৬৯. *তদেব*, পৃ. ২২৪
৭০. *তদেব*, পৃ. ২৪৪
৭১. *তদেব*, পৃ. ২৫৭
৭২. *তদেব*, পৃ. ৩০৯
৭৩. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
৭৪. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৭৫. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ৩৭০
৭৬. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
৭৭. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ৩৯
৭৮. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৭৯. *তদেব*, পৃ. ১
৮০. সুফিদের অভিমত হলো আত্মবিস্মৃত হয়ে সবাইকে প্রীতি দান কর। আর পরের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ কর। মানুষের হৃদয় জয় করাই সবচেয়ে বড় কাজ। একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও বেশি, কেননা কাবা আজরপুত্র ইব্রাহিমের তৈরি একটি ঘর মাত্র। আর মানুষের হৃদয় হচ্ছে আল্লার আবাস। সুফিগণ মরমিয়া ও তাত্ত্বিক সাধক হলেও ইসলাম ধর্মকে কখনো ভোলেন না। পবিত্র কোরানের সমর্থনকেই সম্বল করে জীবনধর্মকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেন। ভোগ পরিমিতিবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদ প্রশ্রয় পেয়েছে সুফিতত্ত্বে। সুফি মতের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মিসরিয় বা নুবীয় লেখক জুননুন (মৃত্যু ২৪৫-৪৬হি.)। তিনি ছিলেন মালিক বিন আনাসের শিষ্য। সুফিবাদ সর্বেশ্বরবাদে রূপ নেয় ইরানের সুফিদের মানসে। আহমদ শরীফ,*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪
৮১. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮
৮২. *তদেব*, পৃ. ১২
৮৩. *তদেব*, পৃ. ১১
৮৪. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ২৪৪। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারগত ভাবনায় বলতে হয়, বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। তবে কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। লোকবিশ্বাস মানুষের আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবনের পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃত লাভ করে। ক্রমে এগুলো মনের গভীরে স্থান পায়।
৮৫. ড. মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোকউপাদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৩২
৮৬. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০
৮৭. *তদেব*, পৃ. ২৫
৮৮. *তদেব*, পৃ. ২৮
৮৯. *তদেব*, পৃ. ৩১
৯০. *তদেব*, পৃ. ২৭
৯১. *তদেব*, পৃ. ৫২
৯২. মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সভ্যতা মানুষের অবদান। সভ্যতা সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে সভ্য, ভব্য আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়। আচরণের সাথে সাথে মানুষ তার চলনে-বলনে ও কথাকে স্পর্শ করতে চায় সভ্যতার চূড়ায়। তাই দৈনন্দিন জীবনে অসভ্য-কুসভ্য শব্দকে আমরা সভ্যভব্য ও সুন্দর অর্থে প্রকাশের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করি। অশোভন, অশুভ, অমার্জিত শব্দের বদলে সদর্থক শব্দ ব্যবহার করাকে বলা হয়

সুভাষণ। অনেক শব্দ আছে যেগুলোকে সব পরিবেশে ব্যবহার করা যায় না, বরং শোভন পরিবেশে ব্যবহার করতে গেলে একটু ইতস্তত মনে হয়। এছাড়াও অনেক শব্দ আছে যা অশুভ বা অকল্যাণ জ্ঞাপন করে। তাই মানুষ এমন শব্দগুলো ব্যবহার করতে চায় না। তখন আশ্রয় গ্রহণ করে সুভাষণের। ভয়ঙ্কর বা ক্ষতিকারক কোনো নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় নির্দোষ বা প্রশংসাসূচক শব্দ। যেমন: মন্দির শব্দের অর্থ গৃহ, কিন্তু এখন এর অর্থ হচ্ছে দেবতার গৃহ। আবার গ্রিক ভাষার শব্দ 'এরিনিয়েস' এর অর্থ 'ক্রুদ্ধজন'। কিন্তু এ নামের ব্যবহারে অকল্যাণ ঘটতে পারে বলে তাকে দেওয়া হয়েছে সুভাষিত অভিধা 'অয়মেনিদেস' যার অর্থ উদার বা দয়ালু। বাংলায় বসন্তের দেবীকে বলা হয় শীতলা। তাই নানাভাবে সুভাষিত শব্দের ব্যবহার হয়।

৯৩. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৯৪. *তদেব*, পৃ. ১০৩
৯৫. *তদেব*, পৃ. ১৬৮
৯৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭
৯৭. *তদেব*, পৃ. ৭
৯৮. *তদেব*, পৃ. ৩০
৯৯. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৪৮
১০০. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২
১০১. *তদেব*, পৃ. ১১৩
১০২. *তদেব*, পৃ. ২২৩
১০৩. *তদেব*, পৃ. ১৩৭
১০৪. *তদেব*, পৃ. ১৩৮
১০৫. *তদেব*, পৃ. ৫২।
১০৬. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩
১০৭. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯
১০৮. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগক্ত, পৃ. ১৮৪
১০৯. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য*, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১১০. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
১১১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১১২. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১১৩. আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১১৪. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *তদেব*, পৃ.২৯১
১১৫. শ্রেণি বৈশিষ্ট্য অনুসারে পয়ার ছন্দ কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত। সেগুলো হলো-তরল পয়ার, মালঝাঁপ পয়ার, মালতী পয়ার, বিশাখ পয়ার, পর্যায়সম পয়ার, মধ্যসম পয়ার, কুসুম মালিকা, হীনপদ পয়ার, ভঙ্গ পয়ার ও প্রবহমান পয়ার।
১১৬. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
১১৭. অলংকার শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে সংস্কৃত 'অলম' শব্দ থেকে। অলম শব্দের অর্থ হলো ভূষণ। আর ভূষণ শব্দের অর্থ গহনা, সজ্জা, অলংকার। আভিধানিক অর্থে বলা হয়-যা দ্বারা সজ্জিত বা ভূষিত করা যায় তাই অলংকার। কাব্যের অলংকার হলো তার ভিতরগত বা আত্মিক সৌন্দর্য। উপমা, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, যমক ইত্যাদি অলংকারের বাহন। অলংকারকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একটি শব্দালংকার এবং অপরটি অর্থালংকার।
১১৮. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
১১৯. *তদেব*, পৃ. ১৬০
১২০. *তদেব*, পৃ. ১৪৪
১২১. *তদেব*, পৃ. ৮৮
১২২. *তদেব*, পৃ. ১১৬
১২৩. *তদেব*, পৃ. ২৫৬

১২৪. অলংকার শাস্ত্রের অন্তর্গত যমক অলংকার শব্দালংকারের একটি শাখা। অর্থবোধক বা অর্থপ্রকাশক একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হলে যমক অলংকারের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ আছে। যার একাধিক অর্থ বর্তমান। যুগে যুগে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকগণ কাব্যসাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য বা বাক্‌চাতুরি সৃষ্টির লক্ষ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। তাই বলতে হয়, বিভিন্ন অর্থবোধক একই শব্দ বা সমোচ্চারিত শব্দ নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে যদি বাক্যের মধ্যে দুই বা ততোধিকবার উচ্চারিত হয়, তখন তা যমক অলংকার হিসেবে পরিণত হয়।

১২৫. রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত, *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১২৬. *তদেব*, পৃ. ৫

১২৭. *তদেব*, পৃ. ৯০

১২৮. *তদেব*, পৃ. ১৬২

১২৯. *তদেব*, পৃ. ১৬৫

১৩০. আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

১৩১. রাজিয়া সুলতানা, *নওয়াজীস খান ও গুলে বকাওলী কাব্য*, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৩২. *গুলে বকাওলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

১৩৩. প্রফেসর মুহম্মদ আবুল ফজল সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা, ২০০৯), পৃ. ১১২৯ আধুনিক যুগে নাট্যসাহিত্যের যে বিকাশ ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যে তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে নাটক এক ব্যতিক্রমী শিল্পাঙ্গিক। নাটকের আঙ্গিকগত ও বিষয়চেতনাগত একটি সার্বজনীন ধারণা সাহিত্যতত্ত্বের স্বীকৃত বিষয়। তথাপি দেখা যায় দেশে দেশে নাটকের বিচিত্র প্রকরণ। এ প্রকরণ যেমন শারীরিক বিশিষ্টতায় চিহ্নিত, তেমনই আত্মিক স্বরূপে ভিন্ন।

১৩৪. ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬